BANGLA KOUNTERKULTURE ARCHIVE MAGAZINE

**ODDJOINT**

001 / APRIL 2015

# ১. আজি হতে দ্বিসহস্রবর্ষ পরে কিউ ও সুরজিৎ

কে তুমি পড়িছ আমাদের লিঙ্কখানি?

## আ মিডসামার নাইটস ড্রিম

মদ, গাঁজা, চরস, কোকেন, ট্যাবলেট ছাড়াই আমরা (কিউ/সুরজিত) একটা স্বপ্ন দেখলাম, ঘুমিয়ে নয়, জেগেই। সেই স্বপ্নটা এইরকম:

রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন ১০০ বছর পর যে তাঁর কবিতা পড়ছে, তার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লিখে রাখা উচিত। আমরা ভাবছি ২০০০ বছর। হ্যাঁ, আজ থেকে ২০০০ বছর পরে ৪০১৫ সালে যাঁরা বাংলা কাউন্টারকালচার সম্পর্কে জানতে চাইবেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কিছু লিখে রাখা ডিজিটাল ফর্মে। সেই ৪০১৫ সালে ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনটি প্রতিটি মানবদেহেই ইনস্টলড বাই ডিফল্ট। তার জন্য ওয়াই ফাই বা আই ফোন কি স্মার্ট ফোন কিছুরই প্রয়োজন পড়ে না।

এমনই এক বসন্তদিনে জনা ছয়েক নারী-পুরুষের একটি দল, যারা বাঙালি, ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে হাজির হয় নবগ্রহমণ্ডল থেকে বিতাড়িত প্রাক্তন নবম গ্রহ প্লুটোয়। তখন মহাকাশে আন্তর্গ্রহ ঘোরাফেরা হাওড়া/শিয়ালদা ডেলি প্যাসেঞ্জারি করার মতো সহজ ব্যাপার হলেও প্লুটোয় চট করে কেউ যায় না। কেন? কারণ অভিজাত গ্রহমণ্ডলীর মোড়ল পৃথিবীর (সূর্যের একান্ত আপন) জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা প্লুটোকে আর গ্রহ বলে মনে করেন না। ১৯৩০ সালে যে প্লুটোকে আবিষ্কার করা হল ২০০৬ সালে ৭৬ বছর পর তার গ্রহের মর্যাদা কেড়ে নেওয়া হল। কেন? কারণ প্লুটো বামন, ছোটো আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ২৪৮ বছর! সূর্যের কাছে বা কেন্দ্রের কাছে এটা তো বেশ অবজ্ঞার ব্যাপার (কারণ তার ২৪৮ বছরে ১ বার প্রদক্ষিণ করলেই চলে, যেখানে সূর্যের অনুগত মোড়ল পৃথিবীর ৩৬৫ দিনে ১ বার প্রদক্ষিণ না করলে চলে না) আর অক্ষমতার ব্যাপার (যার ২৪৮ বছর প্রদক্ষিণ করতে লাগে সে গ্রহ হবার যোগ্য নয়)। প্লুটোর কাছে যা নিজ বৈশিষ্ট্য। ৭৬ বছর ধরে এই অবজ্ঞা আর অক্ষমতা সহ্য করার পর মোড়ল ঠিক করে যথেষ্ট হয়েছে। ওটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও সমাজ থেকে।

সেই থেকে প্লুটো পরিত্যক্ত, প্রান্তিক, প্লুটো হল অভিজাত অষ্টগ্রহমণ্ডলের উলটোদিকে দাঁড়ানো একা কাউন্টারকালচার। প্লুটোর মতো দুটো হয় না। ৪০১৫তে সেই প্লুটোতে গিয়ে বাঙালি দলটি ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিনের মারফত জানতে পারে একমাত্র প্লুটোয় এলেই ODDJOINT#Banglablack এর লিঙ্কটি পাওয়া যায়। তাঁরা সবাই যে যার সার্চ ইঞ্জিনে লিঙ্কটি খুলে একে একে সব লেখা পড়তে শুরু করেন। পড়তে গিয়ে দেখেন বাংলা কাউন্টারকালচারের ঐতিহাসিক ডকুমেন্টগুলি পাতার পর পাতা লেখা আছে। কখন চলে গেছে তাঁদের নিজ গ্রহে ফিরে যাবার শেষ ট্রেন। তাঁরা ঠিক করেন মাসে অন্তত ১ বার তাঁরা প্লুটোয় আসবেনই এবং সমবেত ODDJOINT#Banglablack লিঙ্ক পাঠ করবেন। এইরকম একটি দিনের দিকে তাকিয়েই আমাদের এই বাংলা কাউন্টারকালচারের ইন্টারনেট আর্কাইভিং-এর শুরু।

## বইয়ের পুনর্জন্ম

আমাদের জীবনে বইপত্র বা এককথায় তথ্যভাণ্ডার বলতে বোঝায় লাইব্রেরি বা সরকারি মহাফেজখানা। যেখান থেকে বই নিয়ে আমরা পড়তে পারতাম। লাইব্রেরিতে বসে বা বাড়িতে এনে। আর হ্যাঁ, দোকান থেকে বই কিনেও পড়তে পারতাম। এই সুযোগ নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক মানুষের জন্যে ছিল। এই বইকেই এখন ইন্টারনেটের ভাষায় আমরা হার্ড কপি বলি। এই লাইব্রেরি বা মহাফেজখানা যদি কোনো কারণে ধ্বংস হয়ে যায়, যেমন ইজিপ্টের আল্ক্ষ্ লেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধের কারণে। তাহলে সেই জ্ঞানভাণ্ডারকে উদ্ধার করার উপায় কী? এটি প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন, এই লাইব্রেরি বা মহাফেজখানায় গিয়ে পড়বার সুযোগ নির্দিষ্ট কিছু মানুষের আছে, কিন্তু আরও বেশি সংখ্যক মানুষ কী করে এই জ্ঞানভাণ্ডারের সুযোগ নেবে? তৃতীয় প্রশ্ন, এই জ্ঞানভাণ্ডারকে মানচিত্রের গণ্ডি থেকে মুক্তি দেওয়া যাবে কী করে? যাতে একই সঙ্গে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ এটা ব্যবহার করতে পারে। চতুর্থ প্রশ্ন, লাইব্রেরি বা মহাফেজখানা নির্দিষ্ট সময় খোলে এবং বন্ধ হয়। এই সময়বন্দি জীবন থেকে জ্ঞানভাণ্ডারকে মুক্তি দেওয়া যাবে কী করে? যাতে ২৪ ঘণ্টা সারা পৃথিবীর মানুষ ব্যবহার করতে পারে। পঞ্চম প্রশ্ন, এই জ্ঞানভাণ্ডারকে মালিকানা মুক্ত করা যাবে কী করে? লাইব্রেরি বা মহাফেজখানার মালিক রাষ্ট্র বা কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সেই মালিকের মর্জির ওপর নির্ভর করে সেটা কে ব্যবহার করবে আর কে করবে না। এই সব প্রশ্নের একটাই উত্তর হার্ড কপি সমস্ত বই ও পুঁথির সফটকপি একটি নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটে ডিজিটাল আর্কাইভিং করে ইন্টারনেটে রেখে দেওয়া। এই হল বইয়ের পুনর্জন্মের কথা।

## ইন্টারনেট আর্কাইভ

১৯৯৬ সালে আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো শহরে কিছু মানুষের মনে একটু আগে বলা প্রশ্নগুলোর উদয় হয়েছিল। তাঁরা শুরু করেছিলেন ডিজিটাল ইন্টারনেট আর্কাইভিং। শুধু বই নয়, ফিল্ম, পেন্টিং, মিউজিক সবকিছুরই আর্কাইভিং তাঁরা করে আসছেন গত ১৯ বছর ধরে। ইন্টারনেট আর্কাইভ হল একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। যার কর্মী সংখ্যা ২০০ আর সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে অনেক অনেক স্বেচ্ছাসেবী আর এটি চলে মানুষের দেওয়া ডোনেশনে।

এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন লাইসেন্সে সারা পৃথিবীর সৃষ্টিশীল কাজগুলি রাখা আছে। প্রতিনিয়ত রাখা হচ্ছে। এই ইন্টারনেট আর্কাইভিং-এর কোনো মালিকানা নেই। এটা ফ্রি। পৃথিবীর যে কোনো মানুষ এটা ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারে। ভালো উদ্দেশ্যে করতে পারে খারাপ উদ্দেশ্যেও করতে পারে। ফ্রি এই অর্থে বিষয়টি যে লাইসেন্সের অধীনে আছে সেই লাইসেন্সের শর্তে ব্যবহার করা যাবে। যেন আমার মানিব্যাগটা টেবিলে রাখা আছে, তুমি তোমার প্রয়োজন মতো টাকা নাও, অর্থাৎ বিষয়টা হল আমার যা জিনিস সেটা আমারও এবং সেটা আর বাকি মানুষদেরও। কীভাবে দেব সেটা বলা আছে। যাঁরা এই কাজটি করছেন তাঁরা পরিকল্পনা করেছেন যাতে ৫০০০ বছর পরেও মানুষ এই আর্কাইভ ব্যবহার করতে পারে। এই নিঃশব্দ বিপ্লবটি করে চলেছেন তাঁরা ওই ৫০০০ বছর পরের পাঠকটির কথা ভেবেই।
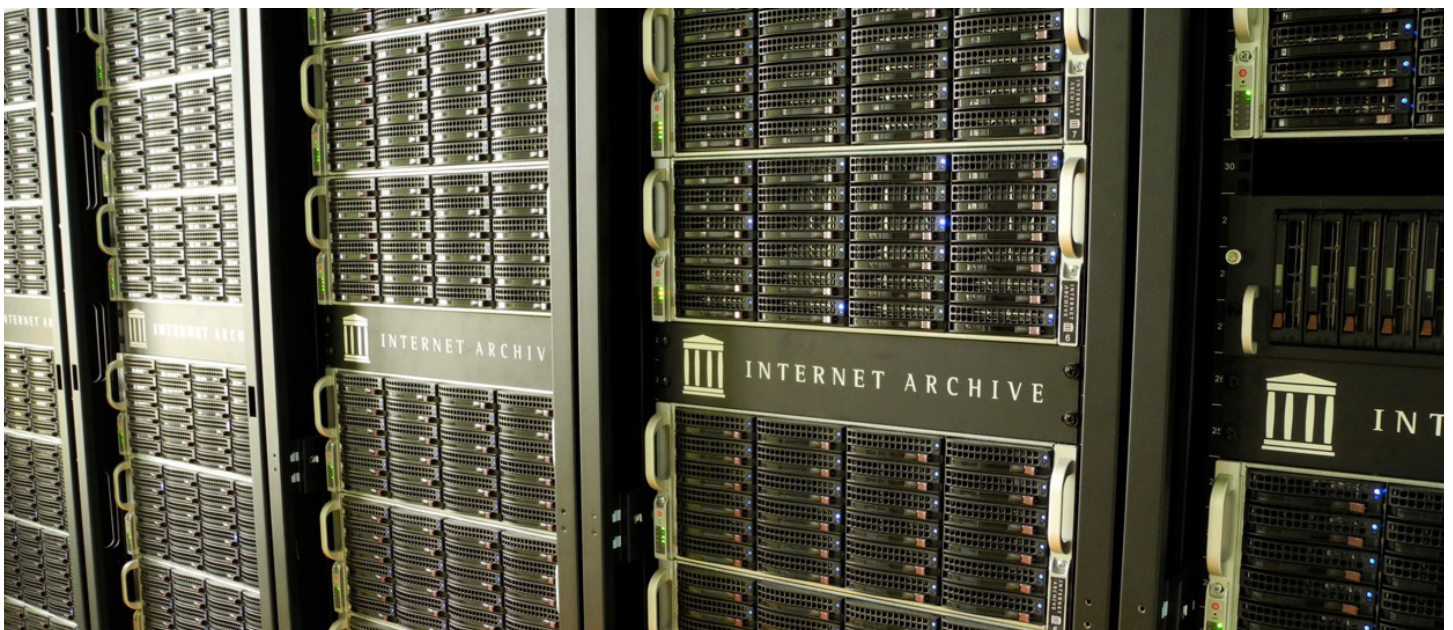
## বাংলায় কাউন্টারকালচার বা বাংলার্ল্যাক

প্রথমেই বলে রাখি 'কাউন্টারকালচার' শব্দটির জন্ম ১৯৬০-এর দশকের আমেরিকায়। এর অর্থ, এটি এমন একটি জীবনযাপন বা ভঙ্গী বা লেখা বা যে কোনো সৃষ্টি; যা সমাজের প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা, ক্ষমতানক্সা, জীবনযাপন ও শিল্পশর্তের উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। আমেরিকায় জন্ম হলেও এই শব্দটি এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আন্দোলন হয়ে সারা ইউরোপে তথা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলা সাহিত্যের নগণ্য পাঠক হিসেবে আমাদের মনে হয়েছে, আমাদের বাংলা ভাষার ইতিহাসেও এক ধরনের সাহিত্য সৃষ্টি হয়ে এসেছে চিরকালই, যে সাহিত্য সমাজের প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতার উলটোদিকে দাঁড়িয়ে আছে। না, সে সাহিত্য কোনও সামাজিক আন্দোলনের চেহারা নেয়নি, কিন্তু টেক্সটগুলো পড়তে গিয়ে যে ভাষা ও বাস্তবতার মুখোমুখি হচ্ছি তাকেই আমরা কাউন্টারকালচার সাহিত্য বলছি। যদিও যে সময়কালের সাহিত্য থেকে আমরা বিষয়টিকে চিহ্নিত করবে, তখন 'কাউন্টারকালচার' শব্দটির জন্মই হয়নি। কিন্তু শব্দটি আমরা ব্যবহার করছি, কারণ বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করতে আমাদের সুবিধে হবে। একদম চুলচেরা ঐতিহাসিক কালক্রম মেনে আমরা টেক্সটগুলোকে চিহ্নিত করছি না, একটা মোটামুটি কালক্রম মেনে চলার চেষ্টা করছি। সাল-তারিখের ভুল হতে পারে, কিন্তু সে ভুলে বিষয়টির তাৎপর্য কিছুমাত্র কমে না।

শুরু করতে চাই চর্যাপদের কবিদের দিয়ে। চর্যাপদের কবিরা ছিলেন সমাজের শ্রমজীবী নিম্নবর্গের মানুষ। পেশায় এঁরা ছিলেন তাঁতি, চামার, কুমোর, ধোপা, দর্জি। লুইপাদ, ভুসুকপাদ ও আরও অনেক চর্যাপদের কবিরা ছিলেন দেহতত্ত্বের সাধক। তাঁরা যে দেহতত্ত্বের চর্চা করতেন সেই যৌনযোগাভ্যাসে সমাজের অনুমোদন ছিল না। এঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল ১. এঁরা সামাজিক অনুশাসন ও জাতিবৈষম্যের বিরোধিতা করতেন। ২. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতেন না। ৩. নানা ধরনের মাদক ব্যবহারের সংস্কৃতি এঁদের মধ্যে ছিল। ৪. ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদনের বদলে নারী-পুরুষের দেহ মিলনের মধ্যে দিয়ে দেহমনের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টাই ছিল এই সাধকদের কাম্য। চর্যাপদের কবিরা এমন ভাষায় লিখতেন যে, তার দু'রকম মানে হতে পারে, যে ভাষাকে তাঁরা সান্ধ্যভাষা বলেছেন। যে ভাষা অদীক্ষিত পাঠক একরকম অর্থ বুঝবেন আর দেহতত্ত্বের সাধকরা যার প্রকৃত অর্থ বুঝবেন। এই সান্ধ্যভাষাকে আমরা মনে করি কাউন্টারকালচারের ভাষা আর সেই ভাষার কবিরা হলেন আমাদের চোখে কাউন্টারকালচার কবি। সমাজের যে চালু ভাষা তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে সান্ধ্যভাষার এই নির্মাণ—চর্যাপদের কবিদের এ এক ভাষাবিপ্লব। এই সাধকদেরই উত্তরসূরি লালন ফকির। এই নিয়ে আমরা পরে আবার লিখব। বাংলা সংস্কৃতিতে যা কিছু কাউন্টারকালচার সেই সব বিষয় আমরা এই বাংলার্ল্যাক উদ্যোগের মাধ্যমে ইন্টারনেটে আর্কাইভে রাখতে থাকব।

নন্দলাল বসুর কল্পনায় লালন

## কেন ইন্টারনেটে আর্কাইভ?

আমরা দেখেছি যে যখন শাসন করে সে তার মতো করে ইতিহাস লেখে। সেটা শাসকের ইতিহাস। উলটোদিকের মানুষদের কথা সেই ইতিহাসে লেখা থাকে না। যদি না কোনো গবেষক সেটি খুঁজে বের করেন। ইন্টারনেট আসার পর ইতিহাসের এই একমাত্রিকতা ভেঙে চুরমার। এখন উলটোদিকের মানুষদের লেখা, ভাবনা ইত্যাদিও লিখে রাখা যাচ্ছে ইন্টারনেটে। সেটি আপামর জনগণ যেকোনো সময় ইচ্ছে করলেই পড়তে পারে। আমরা যেহেতু কাউন্টারকালচারে বিশ্বাসী তাই আমাদের ধারণা সমাজে নতুন ধরনের ভাবনাচিন্তার যোগান কাউন্টারকালচারিস্টরাই দিয়ে এসেছে। যার ফলে সমাজও এগিয়েছে। যারা শাসক তারা সমাজকে ম্যানেজ করে একটা কোম্পানি চালানোর মতো আর কাউন্টারকালচারিস্টরা সমাজ গড়ে বা গড়তে চায় তাদের ভাবনায়। তো এই কাউন্টারকালচারের ইতিহাসটা

কোথাও লিখে রাখা দরকার, ইন্টারনেট আর্কাইভ হল সঠিক জায়গা এটার জন্য। আমরা বাঙালি, তাই বাংলাতে লিখে রাখার কথা ভেবেছি। গত ৫ বছরে আমাদের দেশে যা যা ঘটেছে তাতে মনে হচ্ছে গণতন্ত্র ব্যাপারটাই ইউটোপিয়া। একমাত্র জায়গা হচ্ছে ইন্টারনেট যার কোনো মালিকানা নেই। ইন্টারনেটের মালিকানা এখনও কারোর কাছে নেই বলে এই জায়গাটা এখনও ফ্রি স্পেস হয়ে রয়ে গেছে। আর্টিস্ট হিসেবে আমাদের কাজ হল আমাদের দেশে যত রকমের কাউন্টারকালচারের ভাবনা চিন্তা হয়েছে তার একটা ডকুমেন্টেশন করা। কিন্তু সেই জায়গাটা একেবারেই নিয়ে নিয়েছে কনজিউমারিস্ট কালচার ও রাজনীতি। এখন যেকোনো জিনিসের একটা দাম নির্ধারণ করা হয় এবং সেই দামে জিনিসটি বেচে লাভ না হলে সেটার কোনো মূল্যই নেই। আমরা এরকম দাবিও করছি না যে আমরা মার্কেট ফোর্সের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারব। সারা বিশ্ব জুড়ে যে ইন্টারনেট স্বাধীনতার লড়াই চলছে সেই লড়াইয়ে আমরাও একটা ছোটো অংশ নিতে চাই। সেই লড়াইটা হল যে তথ্যগুলো আমাদের কাছে আছে সেগুলো নিঃস্বার্থভাবে পাবলিক ডোমেইনে তুলে দেওয়া। আমরা দেখেছি আমাদের তৈরি ‘গান্ডু’ ফিল্মটি ইন্টারনেটে পাওয়া যাওয়ায় সারা ভারতের এবং বাংলাদেশেরও অধিকাংশ মানুষ দেখেছে। একটি ফিল্ম সেন্সর, ডিস্ট্রিবিউটর, বিজ্ঞাপন ও মাল্টিপ্লেক্স ছাড়াই হাজার হাজার মানুষের কাছে পৌঁছল শুধু ইন্টারনেটের কল্যাণে। বোঝাই যাচ্ছে আগামীদিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হাতিয়ার ইন্টারনেট। মাও সে তুং স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, সাংস্কৃতিক বিপ্লব করতে গেলে প্রথমেই পার্টির সদর দপ্তরে কামান দাগতে হবে। যে সদর দপ্তর বিপ্লবী সংস্কৃতির (যা পার্টি অনুমোদিত নয়) ওপর খবরদারি করে। মাও যে প্রতীকী সাংস্কৃতিক কামানটি দাগবার কথা বলেছিলেন, এখন বলা যায়, উলটো তত্ত্বে সদর দপ্তর কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রতিটি দপ্তরই এখন সদর দপ্তর বা কোনো দপ্তরই আর সদর দপ্তর নয়। ■

# ২. অহিংস বিপ্লবের গল্প আর সত্যিও সুচেতা ঘোষাল

আমার স্কুলজীবনের এক অঙ্কের মাস্টারমশাই ছিলেন, ভীষণ রাগী। সবসময় মনে হত, যাবতীয় জটিল বীভৎস গাণিতিক সমস্যা তাঁর ওই মেজাজের ভয়ে নিজেদেরই সমাধান করে ফেলত। আমি যখন থেকে তাঁকে দেখেছি তখন কিন্তু তাঁর বয়স সত্তরের ওপর—কিন্তু অমন নিখুঁত শিরদাঁড়া আমি আর কখনও কোনও বয়সের মানুষেরই দেখিনি। বার তিনেক হার্ট অ্যাটাক আরও নানাবিধ শারীরিক সমস্যা ছাপিয়ে যখন গমগমে গলায় ধমক দিতেন কতবার সত্যি সত্যি কেঁপে উঠেছি। এক একটা সন্ধ্যের দৃশ্য ছিল—উনি মোটা কালো ফ্রেমের চশমাটার ওপার থেকে কটমট করে তাকিয়ে রয়েছেন দুরূহ থেকে দুরূহতর অঙ্কের মতো দেখতে একটা আস্ত বাঁশের দিকে, চোখের পাতা পড়ছে না বললেই চলে, এর মধ্যে শুধুমাত্র একটা ঘ্যানঘ্যানে ছন্দে কাঠপোকারাই শব্দ করার হিম্মত দেখাচ্ছে, বাকি সমস্ত চরাচর অপেক্ষায়, কখন চশমা ছাপিয়ে চোখটা চকচক করে উঠবে, হালকা একটা হাসি এসে মিলিয়ে যাবে হুঙ্কারে, ''কী অঙ্ক স্যার! নিমাই কুণ্ডুকে ঘোল খাওয়াবে ভাবছিল! থার্ড ক্লাস অনার্স হতে পারি, কিন্তু তাকিয়ে থেকে অঙ্কের হাড় পাঁজর অবধি দেখে নেওয়ার ক্ষমতা রাখি।'' আমার মাঝেমাঝেই ওনাকে গল্পে পড়া দাপুটে শিকারিদের মতো মনে হত, বাঘছালের বদলে ঘর ভর্তি খাতার পর খাতা সাজানো, তাতে সব প্রায় মানুষখেকো অঙ্কেরা বিভিন্ন নাটকীয় সন্ধেতে শিকার হয়েছে। ইনিই মাঝেমধ্যে আমাদের বলতেন, ''বুঝলে স্যার, জ্ঞান কারোর বাবার সম্পত্তি নয়।''

উইকিপিডিয়ায় আমরা ঠিক এইটাই ভেবে এসেছি। এই আগের গল্পটা ফাঁদার কারণ এটা বলার জন্য যে, এই একরোখা সত্তরোর্ধ মাস্টারমশাই কিন্তু ইন্টারনেট থেকে বহুদূরে, আমি যতদূর জানি উইকিপিডিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানেনও না। কিন্তু এই দাবিগুলো খুব সহজ দাবি, খুব বেসিক, বহুদিনের, এবং বহু প্রজন্মের। তার ট্রিগার ও প্রকার বদলেছে মাত্র, মেজাজটা কিন্তু একটুও অচেনা নয়। উইকিপিডিয়া শুরু হয় জ্ঞানকে মুক্ত করার স্বপ্ন নিয়ে। এই মুক্তির সংজ্ঞা রিচার্ড স্টলম্যান প্রণীত ফ্রি সফটওয়ারের চারটি মৌলিক ফ্রিডমের দাবিকেই ফলো করে। সফটওয়ারটি ব্যবহারের স্বাধীনতা—সফটওয়ারটির সোর্স কোড পাঠ করার স্বাধীনতা—অন্যদের সঙ্গে সফটওয়ারটি শেয়ার করার স্বাধীনতা—এবং তাকে সাধ্যমতো উন্নত করার স্বাধীনতা, এইসব একজন ব্যবহারকারীর থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি। উইকিপিডিয়া অন্যদিকে একটি বিশ্বকোষ—কোনও সফটওয়ার নয়।

এখানে এমন একটা পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি আমরা, যেখানে প্রতিটি মানুষ বিনামূল্যে মুক্তভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে পারবে। এখান থেকে যেমন তথ্য জানা যায়, ব্যবহার করা যায়, তেমনি নতুন তথ্য বা বিশেষ কোনো বিষয়বস্তু সংযোজন করা যায়।

ইউকিপিডিয়াতে এখন পর্যন্ত ৩ কোটি ২০ লাখের বেশি নিবন্ধ রয়েছে। পৃথিবীর ২৮৭টি ভাষায় উইকিপিডিয়া চালু রয়েছে। আর প্রতি মাসে আমাদের ওয়েবসাইট প্রায় ৫৫ কোটি মানুষ ব্যবহার করে। উইকিপিডিয়া থেকে শুরু হয়ে এই প্রয়াস ছড়িয়ে গিয়েছে আরও বেশ কয়েকটি সিস্টার প্রজেক্টসের মধ্যে দিয়ে—তাদের চেষ্টা আরও অন্য বিষয়ের মুক্তির কথা বলে।

ব্রিউস্টার কেল

**ক্যারেন স্যান্ডলার, আমার পরিচিত একজন মানুষ, নিজেকে সাইবর্গ ল-ইয়ার বলেন। ক্যারেনের শরীরে পেসমেকারটি বন্ধ হলেই ক্যারেন মারা যাবেন। ওর দাবী শুধু এইটুকু যে ওই পেসমেকারের সফটওয়ারটি সম্পর্কে উনি জানতে চান।**

উইকিবুকসের মূল স্বপ্ন যদি হয় টেক্সটবুকের মুক্ত অল্টারনেটিভ তৈরি করা, উইকিমিডিয়া কমন্স নামক চেষ্টাটি কপিরাইটকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কয়েক লক্ষ ছবিকে এনেছে পাবলিক ডোমেনে। উইকিসোর্স তৈরি করেছে একটি মুক্ত পাঠাগার—পাবলিক ডোমেনে এসে যাওয়া কত বই সেখানে ঠাঁই নিয়েছে। কত লেখক দুনিয়াজুড়ে নিজেদের সৃষ্টিগুলোকে রেখেও দিচ্ছেন এখানেই, পাবলিক ডোমেনে, উপযুক্ত ক্রিয়েটিভ কমন্সের লাইসেন্স সমেত।

উইকিপিডিয়া এবং বাকি প্রজেক্টগুলোর কাঠামো, অর্থাৎ যে সফটওয়ারটি এই বিশাল কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি, সেই মিডিয়াউইকিও কিন্তু একটি মুক্ত এবং ওপেন সোর্স সফটওয়ার, এবং তাতে অবদান বহু, বহু ডেভেলপারের। উইকিপিডিয়া সহ এই প্রজেক্টগুলোর ছাতা হল —উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশান—একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। কিন্তু তার বয়স উইকিপিডিয়ার থেকে কম, মানে, এই বিশাল প্রচেষ্টার প্রাথমিক মডেল কিন্তু স্বেচ্ছাসেবীদের কন্ট্রিবিউশান নির্ভর।

মানুষ, আমাদের পাশের বাড়ির, পাশের শহর-দেশ-মহাদেশের মানুষের ইচ্ছা দিয়েই কিন্তু তৈরি হয়েছে কোটি কোটি নিবন্ধ। ইচ্ছেই তো, প্রথম তো ইচ্ছে, তারপর তারা ভালোবেসেছে, ভালোবেসে চলেছে। এবং সর্বোপরি এই বিপ্লবটুকু তাদের প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে, হচ্ছে। এই লড়াই-এর মজা হল এখানে সবাই রাজা, অথবা সবাই মজুর, সবাই, সমান। একজন অনামী ব্যবহারকারী তার IP addressটুকু ইতিহাসের জিম্মায় রেখে অন্তত কয়েক সেকেন্ডের জন্য হলেও বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন একটা আস্ত বিশ্বকোষের পাতা। তারপর যদি তাতে কিছু ভুল থাকে অথবা এই বদলটি নিছকই খারাপ উদ্দেশ্যে হয়, কিছু মাত্র সেকেন্ডের মধ্যেই তার ব্যবস্থা নেন অন্য কোনও ব্যবহারকারী। আবার এই করতে গিয়ে কখনও হয়তো বিবাদও বাধে প্রবল। তখন উপস্থিত হন প্রশাসকেরা—এরাও ভলেন্টিয়ার—হয়তো বেশ খানিকটা অভিজ্ঞ, তাই এই ধরনের ইমার্জেন্সি সামলানোর জন্য কিছু বাড়তি হাতিয়ার রয়েছে তাদের কাছে। কিন্তু বদলে দেওয়ার ক্ষমতা আছে সবার। আসলে, যে কোনো কোলাবরেটিভ কর্মের একটা বিশাল বড়ো উপায় হল গিয়ে পারস্পরিক বিশ্বাস। জীবনেও যেমন। উইকিপিডিয়া এবং সমস্ত ফ্রি ও ওপেন সোর্স সফটওয়ারেও তাই।

শুধু উইকিপিডিয়া কেন, প্রজেক্ট গুটেনবার্গের কথাই ধরা যাক। এই ওয়েবসাইট ১৯৭১ সাল থেকে এখনও অবধি প্রায় ৪৬,০০০ বইকে এনে দিয়েছে পাবলিক ডোমেনে। এরপর ১৯৯৬-এ জন্ম নিয়েছে ইন্টারনেট আর্কাইভ, এমন এক বিপুল ডিজিটাল মিডিয়ার ভাঁড়ার রক্ষণ করার স্বপ্ন নিয়ে, যাতে সব মানুষের সমান অধিকার। এমন ভাবনার যিনি জনক, সেই ব্রিউস্টার কেল, ভারী সচেতনভাবে চেয়েছিলেন লাইব্রেরি অফ আলেকজান্দ্রিয়াকে ডিজিটালি মানবজীবনে ফিরিয়ে আনতে।

ক্যারেন স্যান্ডলার, আমার পরিচিত একজন মানুষ, নিজেকে সাইবর্গ ল-ইয়ার বলেন। ক্যারেনের শরীরে পেসমেকারটি বন্ধ হলেই ক্যারেন মারা যাবেন। ওর দাবী শুধু এইটুকু যে ওই পেসমেকারের সফটওয়ারটি সম্পর্কে উনি জানতে চান। আশ্চর্য এই যে, যে যন্ত্র এখন ক্যারেনের মতো আমাদের অনেকের শরীর চালায় তার সফটওয়ারটুকু সম্পর্কে আমাদের কিচ্ছু জানার অধিকার নেই। অধিকার আছেটাই বা কার, এরকম প্রশ্ন করছেন ক্যারেন, আমার ডাক্তারের? যার কাছে আমি টেস্ট করাতে যাচ্ছি? আমার শরীরে একটা যন্ত্র ঢুকে শাসন চালাবে কিন্তু তার সিকিউরিটি সম্পর্কে আমাকে কতটুকু জানতে দেওয়া হচ্ছে? ক্যালিফোর্নিয়া নিবাসী ক্যারেন Software Freedom Conservancy-র Executive Director লড়াই করছেন আরও কয়েক লক্ষ মানুষের সাথেই, একসাথে, ভীষণ মৌলিক একটা দাবীর পক্ষে। যাদের পাশ থেকে লড়াই করছে তাদের, ওই ট্রিগার, ট্রিগারটা হয়তো সম্পূর্ণ অন্য কিছু। কিন্তু লড়াইয়ের ভাষাটা এক।

সম্প্রতি একটা কনফারেন্সে জানতে পারলাম মধ্যপ্রাচ্যে নাকি উইকিপিডিয়ার ব্যবহারকারী এবং রচনাকারীর মধ্যে নব্বই শতাংশই মহিলা। আমরা কিন্তু বিশেষ চিন্তিত এমনিতে উইকিপিডিয়ায় কনট্রিবিউটার হিসেবে মহিলাদের খুব কম অংশকেই দেখা যায় তাই নিয়ে, অথচ যেসব শহরের মেয়েদের চোখটুকুও পারলে ঢেকে রাখা হয় রাস্তা ঘাটে, তারাই এমন বিপ্লব ঘটাচ্ছে অন্য গলিতে।

স্টলম্যান ১৯৮০তে যে দাবি এনেছিলেন, তারপর তাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে কত মানুষ, সাধারণ মানুষ। একটা দাবির থেকে তৈরি হয়েছে কত সফটওয়ার, প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, ইন্টারনেটে জাঁকিয়ে বসেছে উইকিপিডিয়ার মতো ওয়েবসাইট, দিনের পর দিন চ্যালেঞ্জ করেছে সৃষ্টির উপর ব্যক্তিগত মালিকানাকে, কপিরাইটকে—খুব কাছ থেকে দেখে বুঝেছি কী এক বিপুল কাণ্ড! অথচ কাছ থেকেই দেখা বোঝা যায় কি সহজ সব তাগিদই কিন্তু পাশে এনেছে কোথায় কোথায় ছড়িয়ে থাকা এত মানুষকে। আসলে কি, স্বাধীনতা ভারি ছোঁয়াচে এক দাবি। আর তার সংক্রমণটুকু রাখার জন্যই আমাদের ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলোকে জড়ো করে রাখা, আমাদের এই বেঁধে বেঁধে থাকা, হাতে হাত রেখে। ■

# ৩. ভাষা: জনৈক সাহিত্যকর্মীর উপলব্ধি

নবারুণ ভট্টাচার্য

ফি বছরই দেখি শীত পালাবার মুখে ভাষা অর্থাৎ বাংলা ভাষা নিয়ে একটি রিচুয়্যাল হয়। রিচুয়্যাল মানেই পুনরাবৃত্তি। সেই একই গান। রিপিট ঘ্যানর ঘ্যানর। কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তির কাটা জাবর-ভাষণ। খুবই অসহনীয় লাগে। কিছু করার নেই। এটাই এ জাতের রেওয়াজ। যতদিন জ্যান্ত থাকবে এরকমই করে যাবে। তবে এই ক্লান্তিকর ভাঁড়ামির মধ্যেই কলকাতার এক হিন্দিভাষী কবি একেবারেই নির্জলা বাংলায় একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। নাম অরভিন্দ চতুর্বেদ। বইটির নাম বড়ই উপাদেয়—'আমি বাংলা খেয়ে বাংলা বলি'। অনেকেই আশা করি উৎফুল্ল চিত্তে অরভিন্দকে স্বাগত জানাবেন। কবিতাগুলোও ভালো। হাড়গোড় আছে, চোয়াল শক্ত। রোদে রাখা কুলফি বরফ নয়।

সম্প্রতি একটি ছোট সাইজের ভাইরাস-আক্রমণ আমার নজরে এসেছে। সেটি হল বিভিন্ন ভাষার বেশ কয়েক হাজার ভারতীয় কমবয়সী মানুষ উঠেপড়ে ইংরিজিতে নভেল মকসো করছে। উদ্দেশ্য বুকার বা ওই জাতীয় কোনো হেভিওয়েট প্রাইজ। এরা নিরাপরাধ। স্বধর্ম ত্যাগ করে ভয়াবহর দিকে ধাবমান। অবশ্যই এর জন্য দায়ি সাহেব প্রবর্তিত গোলকায়ন। সাহেবদের নেক নজরে পড়ে খেলাৎ পেতে হলে নেটিভ হয়ে থাকলে চলবে না। টম, ডিক বা হ্যারি হতে হবে। এই দলে বাঙালিও ভালোমতোই রয়েছে। এই ভাইরাসকে আমরা রাজমোহন-ভাইরাস নাম দিতে পারি? ভালোই শোনায়। তাই না?

সুখের কথা এই যে যাদের মাসি-পিসি হয়, যারা মুড়ি-ফুলুরি খায়, যারা গামছায় গা ঘষে, যারা নড়ে ভোলে ও যাদের ফিক্ করে হাসি পায় এবং দূরে ঢাকের বাজনা শুনে মন কেমন করে তারা কিন্তু বাংলাতেই লিখেছে, লিখছে ও লিখে চলবে। নাইপালের স্টিমারে পাল উঠল কি নামল বা কে কোথা পাল খেতে বা খাওয়াতে চলেছে তাতে একগাছা সুতোও বা সদৃশ কিছু ছেঁড়া যায় না।

বাংলায় মানেটা এই যে, ভাষাকে রক্তহীন, অযৌন, প্লাস্টিকগন্ধী ও ঢ্যামনা করে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছেই। আমাদের কাজ হল এইসব সচেষ্টদের বাংলা মতে ক্যালানো। আগে তেরপল চাপা। তারপর খেঁটো বাঁশ।

তবে এটাও ঠিক যে আমাদের ভাষার মধ্যেও, সাহিত্যের আওতাতেও সাহেব-নেটিভ একটা ঘাপলা রয়েছে। এ নিয়ে কিছু লিখতে হলে অনেক তত্ত্বজ্ঞান থাকার দরকার। সাহেবদের লেখায় 'amplification, digressions and swellings of style' থাকবে, নেটিভদের থাকবে 'primitive purity and shortness', সাহেবরা 'tropes and figures' -এ চমকাবে, নেটিভরা দেখাবে 'unaffected sincerity and sound simplicity'—এগুলো অবশ্য বেশ পুরনো চিন্তা। কিন্তু এর ভেতরেও কিছু মোদ্দা কথা বোধহয় রয়েই গেছে যা আমাদের বেলাতেও খেটে যায়।

মহাপণ্ডিতদের ফুৎকারে, মান্য ভাষা না মেনে চলার অপরাধে, কত কত সাহিত্যকর্মী যে উড়ে গেছে তা গুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু উড়ে যেতে যেতে তারা সকলেই বলেছে 'অনেক ভাটিয়েছেন, এবারে ফুটুন'। হাংরি-রা থাকলে অবশ্যই বলতেন, যেমন তাঁর বলেওছিলেন—'এবার তবে মুখের মধ্যে লাগিয়ে নিন লুপ'। আমরা না হয় কুলুপই বললাম। বাংলায় মানেটা এই যে, ভাষাকে রক্তহীন, অযৌন, প্লাস্টিকগন্ধী ও ঢ্যামনা করে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছেই। আমাদের কাজ হল এইসব সচেষ্টদের বাংলা মতে ক্যালানো। আগে তেরপল চাপা। তারপর খেঁটো বাঁশ।

যা কিছু লিখলাম তা বোধহয় একটু এলোমেলো হয়ে গেল। হোকগে। কিন্তু একটা ধরতাই-এর আদল বোধহয় আঁচ করা যাবে। সেটুকু হলেই চলবে। ■

মে/২০০২/অ্যাকোয়ারিয়াম

ODDJOINT # বাংলাব্ল্যাক

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

বৈশাখ ১৪২২ ● এপ্রিল ২০১৫

# ৪. উদাসীবাবার আখড়া দীপক মজুমদার

এটি কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। এমন একটি জায়গা যেখানে স্বাধীনতা আছে কিন্তু তার অপব্যবহার নেই অর্থাৎ সেই দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও স্বাধীনতা আছে। স্বপ্ন না মায়া না মতিভ্রম? কোথায় সেই জায়গা? বাড়ি, ঘর, চাকরি, বন্ধুবান্ধব, প্রেম, প্রকৃতি এবং এভাবেই আমরা উপস্থিত হই জগৎসংসারে। তার মধ্যে ডুবে যাবার স্বাধীনতা কে রাখে? সেইটাই কি উদাসীবাবার আখড়া!

এমন একটা জায়গা যেখানে গেলেই কিছু বই ঘাঁটা যাবে ইচ্ছেমতো, চা বা কফি আছে, দেয়ালে কারো আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়তো, কোণে বসে কেউ নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছে, প্রুফ দেখছে বা কাঠের ব্লক দিয়ে প্রিন্ট তুলছে, অন্যরা কেউ তাকে বিরক্ত করছে না। সন্ধের দিকে গান তর্ক আড্ডা খণ্ডনাট্য ধিক্কার নীরব বসে থাকা কামনা-সম্পৃক্ত কোনোরকম চালিয়াতি বা অপরকে সরিয়ে রাখা বা নিজের কোঁচা বাঁদিকে উরু অব্দি তুলে দাঁড়ানো শিল্পভাতারি নয়। সশস্ত্র সমাজটাই আজ ক্রমাগত এক ছুঁকছুঁকুনির ভারে নির্বীয হতে চলেছে। এতে কি মানবিক পরিবার উন্নয়ন সম্ভব!

একদিন শৈলেশ্বর ঘোষ এসে তার লেখা পড়লেন, আরেকদিন গনেশ পাইন-এর সঙ্গে আড্ডা তাঁর ছবি সহ। এভাবে ভূপেন খাখার, হবীব তনবীর, শামসের আনোয়ার, ফালগুনি রায়, সুবিমল মিশ্র, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, পবনদাস বাউল, উৎপলকুমার বসু, ইভান ইলিচ, জয়শ্রী রানা, জ্যোতি বসু, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী, খোকন মজুমদার, কৃষ্ণ বাউল, জো উইলিয়ামস, য়ুনানী কবি ও সঙ্গীতকার মিকিস থিওদোরাকিস—ইত্যাদি বিভিন্ন মানুষ আসবেন এখানে, এমনকি মুন্নি, তাতাই, তিতির, গোগো, জীয়ন, পুপলু এরাও কখনো কখনো, যার যা ইচ্ছে বলবে করবে অন্যদেরও যা শোনার যা করার দরকার হয়তো। যদি এমন কিছু হয় যার পিছনে কেবলই ফক্কিকারি, কেবলই ধাপ্পা আর আত্মরতি-সুখসার, কেবলই হীন-নম্রতা তাহলে তাদের বলা হবে মতিলাল শীলের ফ্রি পাঠশালায় গিয়ে তিনদিন একটানা দাবা খেলার চেষ্টা করতে কিংবা ভারতে পাঠরত ইরানি ছাত্রদের শাহানশার বধ্যভূমিতে ফেরত পাঠাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সপরিবারে একদিন রাজভবনের সামনে অবস্থান
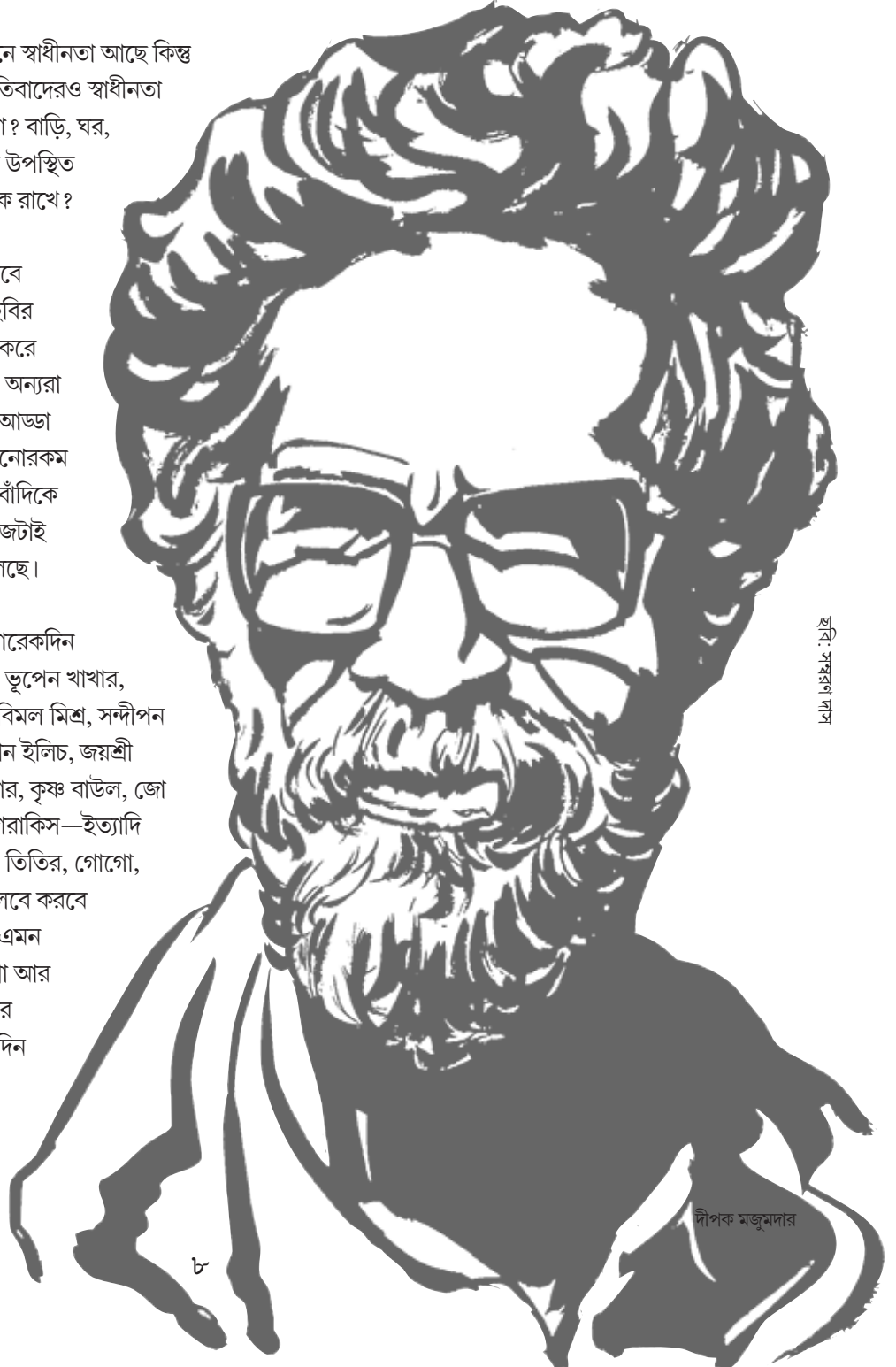
ছবি: সম্বরণ দাস

দীপক মজুমদার

ধর্মঘট করতে।

ব্যাপারটা এই যে, আমাদের চতুর্দিকে ঘটেছে নানা মরা ঘটনার মালা আর সেটা হাতে করেই এক প্রতারক বিবেক বোধের চাবুক খেতে খেতে আমরা ছুটি সত্য শিব ও সুন্দরের লক্ষ্যে। সেখানে এতদিন ছিল অজস্র পদ্ম ও পদ্মশ্রী। এবার নাকি রাশি রাশি গোলাপ। আমরা গমখেকোরা এসে এই গোলাপ লীলার বাজারে/আবার যাই হেরে। অথচ এরই মধ্যে ঝুর ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়েছে প্রাণপতনের শব্দ। যোগ, তুষার, শঙ্কর, বিমল, শান্তিরঞ্জন, ঋত্বিক, কেয়া, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিজন ভট্টাচার্য। জয়গুরু, জয়গুরু।

একটা জায়গা বানিয়ে নিতে হবে। লোকে যাতে বিপদে পড়লে ছুটে আসতে পারে। কিছু টেলিফোন নাম্বার আছে সেখানে। কিছু বিস্মৃতিকামী সম্পর্ক। অর্থ-সাহায্য ছাড়া আর সবকিছু। সবকিছু কি আর সম্ভব, তবু টাকাটা ছেঁটে ফেললে অনেকটা। সোজা ইতিহাসের পেটের ভেতর ঢুকে পড়া, তিমি মাছ, গুরু তিমি, মহা তিমি, ইয়া আ-আ-আ-আ-ল্লা-আ-আ-তিমি খ্যাপার মাগো বাবা গো ভয়-লয়-ক্ষয়-জয়স্ময় তিমি করাল। আমায় ডেকো উদাসীবাবা, আমি আসছি। আসছি চাকতি ঘোরাতে ঘোরাতে মন্টিনেগ্রো থেকে শান্তিপুরে খাতুনের গ্রামে। চলো ওই নদীতে, হেমনদীতে, চান করে আসি গে। গণেশ পাইন বলছিলেন, 'আমাদের চারপাশে আত্মরক্ষার জন্য আর্তি ছাড়া আর কিছু ঘটছে না।' সুনীল দাসের প্রশ্ন, 'একি এক আত্মপর ভ্রম নয়।' দুজনেই কিন্তু অস্থিরপ্রজ্ঞ, ছুঁতে চাইছেন সেই ক্ষতচিহ্নটিকে। আর, এরকম দুমুখো জিজ্ঞাসায় খুঁজলেই তো ক্ষতটা পাঁজর ফুঁড়ে বসে যায়। সেখান থেকে সবুজ লতা গজায়, ফুল ফোটে, প্রবল চুম্বকটানে নত হয় ধার সূর্যালোক। তোমার যা বাড়তি আছে রেখে যাও, যা নেই তা নিয়ে যাও। ওই কোণে সব জড়ো করা আছে। ধীর সূর্যালোক। তুষার চেয়েছিল পৃথিবীর ভার অন্তত দেড় কিলো কমাতে। বাড়িয়ে দিয়ে গেল অন্তত নির্বুদ কিলো। উদাসীবাবার আখড়ায় তার বাটখারা খালি এসো কেউ নেড়েচেড়ে যাও। বোঝো কাকে ওজন বলে। ভয় পাও। ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, তোমায় আমি মারবো না। শুধু খেলাচ্ছলে ভয় পাও, তবেই তো উদ্ধার। খেলাটা জমবে তখন। খেলা, খেলা, খেলা। রক্তক্ষরণের পথে রটে যায় বৃত্তের খবর। তোমার খেলা হল যখনই বৃত্তটি শেষ, তখনই লাফিয়ে তার বাইরে বামিয়ান বুদ্ধের সামনে দাঁড়ানো। শুরু করবে বেরিয়ে আসবে বলে, শুরু না করলে বেরোবার পথ নেই। অতএব উদাসীবাবার আখড়া শুরু করো ছেড়ে যাব বলে।

> যদি এমন কিছু হয় যার পিছনে কেবলই ফক্কিকারি, কেবলই ধাপ্পা আর আত্মরতি-সুখসার, কেবলই হীন-নম্রতা তাহলে তাদের বলা হবে মতিলাল শীলের ফ্রি পাঠশালায় গিয়ে তিনদিন একটানা দাবা খেলার চেষ্টা করতে কিংবা ভারতে পাঠরত ইরানি ছাত্রদের শোহানশার বধ্যভূমিতে ফেরত পাঠাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ সপরিবারে একদিন রাজভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট করতে। ব্যাপারটা এই যে, আমাদের চতুর্দিকে ঘটেছে নানা মরা ঘটনার মালা আর সেটা হাতে করেই এক প্রতারক বিবেক বোধের চাবুক খেতে খেতে আমরা ছুটি সত্য শিব ও সুন্দরের লক্ষ্যে। সেখানে এতদিন ছিল অজস্র পদ্ম ও পদ্মশ্রী। এবার নাকি রাশি রাশি গোলাপ। আমরা গমখেকোরা এসে এই গোলাপ লীলার বাজারে/আবার যাই হেরে। অথচ এরই মধ্যে ঝুর ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়েছে প্রাণপতনের শব্দ।

আলোচ্য বিষয় ১৫ x ২০ ফুট বা ২০ x ২০ ফুট একখানি ছাদওলা আশ্রয়, পায়ের তলায় মাটি আর মাথার ওপরে আকাশ, সংযোগ, গমন পথ, দৃষ্টি ও খিন্নকায় উজ্জ্বল অভিজ্ঞতা। অনেকের জন্য স্নানঘর। সন্ধান চাই। ইচ্ছে চাই, সহযাত্রা চাই, যথার্থ পর্যবেক্ষণ চাই এবং এমন সহজ-কঠিন সম্পৃক্ত হবার জন্য উদাসীন মানুষ চাই।

তাহলেই আখড়াটা সরগরম হবে। দরকারমতো কাজের লোক পাওয়া যাবে, পারস্পরিক খেয়োখেয়ির বিরুদ্ধ স্বভাবে এক ধরনের সাহিত্য কামনা গড়ে উঠবে। আমরা কীভাবে বাঁচতে চাই সে সম্পর্কে খাটুনির একটা মগ্ন পরিবেশ তৈরি হবে। অংশীদার পেলে সেটাও উপভোগ্য হবে। পাঠকের জন্য এই আখড়ার জন্ম ও জীবন অপেক্ষা করছে। এই আখড়ায় তিনি সাদরে আমন্ত্রিত। ■

**কাগজের নৌকো, ১৯৭৭**

# ৫. গ্রাফিতি ও কাউন্টার কালচার

## প্রশ্ন করেছেন **ইমরান ফিরদাউস** আর উত্তর দিচ্ছেন **রনি আহমেদ**

হা রৈ হা রৈ বিজ্ঞাপন আর মুখ (দেখাও আর বিখ্যাত হয়ে যাও) দেখানোর এই ২০১৪-তেও ইমরান ফিরদাউস অ্যানোনিমাস হতে জানেন। আর জানেন বলেই নিজেকে অজ্ঞাত রেখে তাঁর চিন্তা, বাক্য ও গদ্যে গুপ্তঘাতকের মতো বিপজ্জনক হয়ে উঠছেন ক্রমশ। নির্মিত ভাষা ও তাঁর কবজির জোরে ইমরান যা বলেন বা বলতে চান তা পড়ে বিহ্বল হই আমরা; আর বুঝতে পারি, তাঁর গদ্য মানেই এক নতুন ভাষা-সন্ত্রাস। যা তাঁর যে কোনো কাজেই জারি থাকে সর্বদা। এই বাউন্টিকিলারের জন্ম উত্তরবঙ্গে এবং বেড়ে ওঠা ঢাকায়। পড়াশোনা ভাষাবিজ্ঞানে, কিন্তু প্রাণ সঁপেছেন সিনেমায় অথবা যে কোনো রূপের দৃশ্যমাধ্যমে।

রনি আহমেদ হলেন ঢাকা শহরের সেই আর্টিস্ট, যাকে প্রত্যেক এগজিবিশনেই চিনতে হয় নতুন করে। কসমিক ভালোবাসার সন্ধানে থাকা এই মনচাষা শিল্প-সাহিত্য-মিউজিক সবক্ষেত্রেই রেখেছেন তাঁর নির্মম অটোগ্রাফ, গল্পে শোনা, স্বপ্নে ভুলে যাওয়া সব গল্পের, সিটিং-গেইটলকের সাইকো-সার্কাসের নাইভ রিংমাস্টার হিসেবেও মনে রাখতে পারেন রনির নাম। পেইন্টিং, ভাস্কর্য, ভিডিও আর্ট অথবা ইনস্টলেশন আর্ট সর্বত্রই রং-কল্পনা-(অ)প্রকৃত দৃশ্যের ডামাডেলের বুনটের মধ্যে দিয়ে তিনি নির্মাণ করেন হেঁয়ালি ও প্রহেলিকাময় চিহ্নের এক অকাল্ট দুনিয়া। সেই দুনিয়ায় রাজনীতি ও ব্যক্তিসত্ত্বা পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়ায় দিগম্বর চম্পু হয়ে। নতুন নতুন শিল্পভাষায় নিয়ত পরীক্ষণ-প্রয়াসী রনি ঢাকায় বাস করেন একজন সময় পরিভ্রামকের ভূমিকায়। রনির উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে অন্যতম কসমিক টার্টেল ভিজিটিং গ্রিন আর্থ, আর্কিওলজি অফ নোয়াজ আর্ক, টম্ব অফ কারাকোজ, সেভেন হান্ড্রেড মাইল্স স্লিপ ওয়াকিং, টেলস অফ স্যুডো মিথ প্রভৃতি।

গ্রাফিতি— একটা কাউন্টারকালচারের নাম। বুজুর্গগণ ইদানীং বলছেন, পাঙ্ক কালচারের পর সবচেয়ে চর্চিত জীবনযাপন পদ্ধতি হল গ্রাফিতি! এই শিল্পীদের কাছে পৃথিবীর সব দেওয়ালই একেকটা ক্যানভাস। প্রচলিত নীতি বা সিদ্ধান্তের শৈল্পিক প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে চলমান ইস্যুকে সবার নজরে আনতে গ্রাফিতির রয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা। ফলত, ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যে দেওয়ালের শুধু শ্রবণক্ষমতা ছিল, তার মুখে এখন বোল ফুটেছে। সময়ের মতিগতিকে পরিহাস করা একেকটা গ্রাফিতি যেন শহরের শরীরে খোদাই করা একেকটা ট্যাটু। এই ট্যাটু কারিগরদের বলা হয়ে থাকে 'গেরিলা আর্টিস্ট'। গেরিলা যোদ্ধাদের মতো তাদেরও যে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে হয়। রাতের আঁধারে টার্গেট করা দেওয়ালের গায়ে আর্টওয়ার্ক সাঁটিয়ে দিয়েই চম্পট দিতে ওস্তাদ এই লাইনের বান্দারা। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের কিছু কিছু দেশ 'গ্রাফিতি'কে বৈধ করেছে শর্তসাপেক্ষে; ধরা যাক, ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর কথা, সেখানে রিও পুরসভার অনুশাসন অনুযায়ী কিছু বাছাই একং তালিকাবদ্ধ সরকারি ভবন ছাড়া বাকি সব প্রকাশ্য স্থানে দেওয়াল অঙ্কন চলবে। তবে সেই সব গ্রাফিতি বাণিজ্যিক, যৌনরসাত্মক, জাতিবাদী কিংবা বৈষম্যবাদী হলে চলবে না। অধিকাংশ দেশে এখনও গ্রাফিতিকে (অ্যাকাডেমিক) চারুশিল্পের শত্রু বলে মনে করা হয়। সে সব দেশের নগর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষও গ্রাফিতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স মুড়ে থাকে। যেমন, সিরিয়ায় একটি প্রবাদ চালু আছে 'দেওয়াল হচ্ছে উন্মাদের আবর্জনা'! যদিও, সিরীয় আন্দোলনে গ্রাফিতির ভদ্রতায় দেওয়ালই ফাইনালি হয়ে ওঠে মুক্তবাকের অন্যতম জমিন।

রক্ষণশীলদের চোখে তথাকথিত পরিপাটি নগর ও দালান নকশায় গ্রাফিতিগুলি আটকে থাকে স্ট্রেস মার্ক হিসেবে। লন্ডনে শহর নোংরা করার দায়ে গ্রাফিতি লেখকদের চিহ্নিত করা হয়েছে নৈরাজ্যবাদী বা অ্যানার্কিস্ট হিসেবে। স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহলের উদ্রেক হয় গ্রাফিতি বা দেওয়াল শিল্পগুলির বক্তব্য সম্পর্কে! খানিক নজর করে দেখলেই বোঝা যায়, এই শিল্পকর্মগুলি জলবায়ু পরিবর্তনের মতো গ্লোবাল মামদোবাজির সমালোচনা /নাগরিক অধিকার / যুদ্ধবিরোধী আওয়াজ ও শান্তির বার্তার মতো ইত্যাদি রাজনৈতিক ইস্যুতে নাগরিক ইস্তাহারের ভূমিকা পালন করে। তাই, প্রায় সময়ই গ্রাফিতি অ(ন)র্থ উৎপাদন করে সামষ্টিক অবদমনের গালে অটোগ্রাফ রূপে একটি বা কয়েকটি বকেয়া চড় বসিয়ে। পাঠক-পাঠিকা ভুলে গেলেন কি, ২০১৪ সালের ব্রাজিল বিশ্বকাপ চলাকালীন সময়ে স্ট্রিট আর্টিস্ট পাউলো ইতোর আঁকা ভাইরাল মর্যাদাপ্রাপ্ত গ্রাফিতির কথা। যেখানে ক্ষুধার্ত শিশুর সামনে খাবারের বদলে ফুটবল পরিবেশন করা হয়েছিল। আয়োজক দেশ হিসেবে ব্রাজিলের অমিতব্যয়ী আচরণের বাস্তবতা তুলে ধরতে একটি গ্রাফিতিই হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদ ও মৌলিক অধিকার আদায়ের হাতিয়ার।

মুনাফাভিত্তিক রাজনীতিচর্চার কালে পলিসি মেকার, ইন্টেলেকচুয়ালরা যখন 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'র লাইনে আরামে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন গ্রাফিতিই যেন উঠে দাঁড়ায় নিঃশব্দ স্লোগানের অস্থিরতায়। ধারণ করে যৌবনের ভাষা, রচনা করে শ্লেষের পঙ্‌ক্তিমালা। ঐতিহাসিক বাস্তবতার ঐতিহ্য বজায় রেখে প্রতিষ্ঠানের লোভাতুর অফারে যেভাবে অনেকেই নাম লিখিয়ে থাকেন অবসরপ্রাপ্ত প্রগতিশীলের খাতায়, তেমনই অনেক 'গেরিলা আর্টিস্ট'কেও আকছার বিকোতে দেখা যায় ক্রিস্টি বা সদবির নিলামঘরে। কিন্তু এতে টেনশন করার কিছু নেই। ঘটমান অতীত বা বর্তমান কালের প্রায় অধিকাংশ বিক্ষোভ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আন্দোলনে গ্রাফিতি হয়ে উঠেছে নৈমিত্তিক অনুষঙ্গ। দিল্লির ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন, অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট, ইউক্রেন সঙ্কট, অ্যান্টি ইজরাইল মুভমেন্ট, যুক্তরাষ্ট্রে মারিজুয়ানা বৈধকরণ আন্দোলন অথবা একদম তাজা ইভেন্ট— কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে জমে ওঠা 'হোক কলরব'— কোথায় নেই গ্রাফিতি।

বাংলাদেশে গ্রাফিতির রেগুলার প্র্যাক্টিস না থাকলেও বিচ্ছিন্নভাবে এর চর্চা চোখে পড়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম-সহ বিভিন্ন শহরের দেওয়ালের গতরে। স্বাধীন বাংলার লোকালয় মৃদু মানুষে পরিপূর্ণ হলেও লোকাল গ্রাফিতিগুলিতে দেখা যায় উড়াধুরা চার্জ। লেখকের নাম কখনও চোখে পড়ে আবার কখনও বা অজ্ঞাতই রয়ে যায়। পরন্তু, গ্রাফিতিটা মস্তিষ্কের শো-কেসে শেলভ্‌ড হয়ে যায় আজীবন সদস্যের মতো। এই ক্ষণে, স্মরণ করা যেতে পারে আইজুদ্দিনকে। গ্রাফিতিবিহীন, কিন্তু রাজনৈতিক ও বিজ্ঞাপনী চিকাবহুল ঢাকা শহরে তিনিই (আছেন) ছিলেন একমাত্র ট্যাগ মাস্টার। এই শহরের খুব কম দেওয়াল আছে যারা 'কষ্টে আছে আইজুদ্দিন'-এর মধ্যে দিয়ে জনৈক আইজুদ্দিনের কষ্ট ধারণ করেনি। ট্যাগিং টাইপোগ্রাফি বেইজড এক প্রকার গ্রাফিতি আর্ট। তো গ্রাফিতির হাল-হকিকত, এর ফ্যাশন বনাম রেবেল সত্ত্বা, অল্টারনেটিভ নাকি এক্সপোজার পিয়াসি আর্টিস্টদের স্টেপিং স্টোন এবং বিবিধ খুচরো বিষয় নিয়ে এই বছরের গোড়ার দিকে দীর্ঘ কথা হয় আর্টিস্ট রনি আহমেদের সঙ্গে। গ্রাফিতি নিয়ে আলাপ করতে চাইলেও হাইপারটেক্সচুয়াল বাস্তবতার কারণে আলাপ-সালাপ উড়ে বেরিয়েছে শিল্পের বিভিন্ন মগডালে, শাখা-প্রশাখায়।

ব্যাঙ্কসি গ্রাফিতি :১

**ইমরান ফিরদাউস: গ্রাফিতি বিষয়ে সমাজ, রাষ্ট্রের এত নিহিলিস্ট অ্যাপ্রোচ কেন?**

রনি আহমেদ : গ্রাফিতিটা একধরনের ভায়োলেশন অফ ল। আর্টের একটা কথা আছে যে, ডিস্টার্ব না করলে আর্ট হয় না। এটা কাইন্ড অফ সোশ্যাল ডিস্টার্বেন্সেরই জায়গা। ধরুন, আপনি একটা সুন্দর দেওয়াল বানিয়েছেন বা সরকার কিছু একটা বানিয়েছে, ওখানে আপনি কিছু একটা এঁকে দিলেন। তো এটা আসলে মানুষের (শিল্পী বা আমজনতা যেই হোক) স্বাধীন মনেরই প্রকাশ। কারণ, মনের মধ্যে কোনো আইন থাকে না। যখন অনেক মন একসঙ্গে হয় তখনই আইন দরকার হয়। কিন্তু একা মনের কোনো আইন নেই। যখনই দ্বিতীয়জন আসে তখনই আইন তৈরি হয়।

**পারস্পরিক বোঝাপড়ার স্বার্থেই আইনটা তৈরি হয়?**

মানে আইনের নিয়মই হচ্ছে, আইন একা হয় না। অন্তত দু'জন লাগে। এবং সংখ্যা যখন বাড়তে থাকে, তখন আইনের বিভিন্ন ধারা- উপধারা বেরোতে থাকে। আইন হচ্ছে জাস্ট একটা মাইন্ড কন্ট্রোলিং সিস্টেম। এখন, মাইন্ড কন্ট্রোলের জায়গাগুলো যারা অসত্য বলে ঘোষণা করে তারা গ্রাফিতিতে যায়। এর মানে আর্টে যাওয়াই হচ্ছে আসলে এক ধরনের মাইন্ড কন্ট্রোলের বিরুদ্ধে যাওয়া। আর্টে যদি আপনি সিরিয়াসলি ইনভল্‌ভড হন এবং যদি আপনি সত্যিকারের শিল্পী হন...তখন সব ধরনের মাইন্ড কন্ট্রোলের বিরুদ্ধে আপনার যে বিদ্রোহ ...এটাই আর্ট।

**গ্রাফিতি আসলে সেটাই করে...**

আবার মাইন্ড কন্ট্রোল অনুযায়ীও আর্ট করা যায়, সে ধরনের শিল্পীরা আছে। এরা ঠিক শিল্পী নয়, বরং বলা যায় 'স্লেভ আর্টিস্ট'। ওটাই আলাদা ব্যাপার, ওটা নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। তো, আর্টিস্ট বা শিল্পীরা মাইন্ড কন্ট্রোলের বিরুদ্ধে কথা বলতে চায়। আর আমরা তো জানিই, সোসাইটির কাজই হচ্ছে মাইন্ড কন্ট্রোল করা। আপনাকে কন্ট্রোল করতে হলে, আপনার দেহ কন্ট্রোল করে তো মুনাফা নেই, তাই সোসাইটি আপনার মাইন্ডটা আগে কন্ট্রোল করবে। তারপরে সব শেষে গিয়ে আপনার দেহ কন্ট্রোল করবে। আর আপনি যদি বিরুদ্ধাচারণ করেন, তখন সোসাইটি বলুন বা সরকার অথবা রাষ্ট্রই বলুন, তারা আপনার দেহটাকে আইনের বেড়াজাল দিয়ে বেঁধে ফেলতে একপা-ও পিছুপা হবে না।

ব্যাঙ্কসি গ্রাফিতি :২

**অর্থাৎ, সরকার রাজের হাতে প্রজা বা জনগণকে এক্সপ্লয়েট/ম্যানুপুলেট করার একশো একটা টিপস বা উপায় সব সময় স্ট্যান্ডবাই থাকে...**

কিংবা তাকে টর্চার করো। মানে মাইন্ড কন্ট্রোলিংটা খুবই সফ্‌টকোর ওয়েতে হচ্ছে এবং অনেক সময় মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক রকম মজার মজার জিনিস দিয়ে করা হয়। ওটাও একটা কন্ট্রোলিং সিস্টেম, যেটা অরসন অরওয়েল আগেই বলে গেছেন যে, এক ধরনের বিগ ব্রাদার্স থাকে, (অদৃশ্য) ওয়াচ টাওয়ার থাকে। কুতুবমিনারও এক ধরনের ওয়াচ টাওয়ারই ছিল। আর এখন তো অদৃশ্য ওয়াচ টাওয়ারের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে। এখন, এটা আর আর্কিটাইপের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটা যে এখন কোন পর্যায়ে গেছে কেউ জানে না।

**আমরা তো এখন প্রতি মুহূর্তে ইমেজ দ্বারা বোম্বার্টেড হচ্ছি...মানে উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে হোর্ডিং আর বিলবোর্ডের সঙ্গে টক্কর খেতে হয়...**

তবে, আমার মনে হয় মাইন্ড কন্ট্রোলিংয়ের শুরু 'ঘড়ি' মানে রিস্ট ওয়াচের ধারণা থেকে আর কি। আগেও ছিল অন্যভাবে! কিন্তু মাইন্ড কন্ট্রোলের যে মর্ডান স্ট্রাকচার আমার মনে হয় এটা রিস্টওয়াচ থেকে শুরু হতে পারে। ব্যাপারটা এমন যে, আমি হাতের মধ্যে সময় বেঁধে দিলাম, সময়। এই সময় অনুযায়ী তুমি চলবে। এবং এই সময় অনুসারে তুমি একের অধিক মানুষের সঙ্গে বিভিন্ন কাজকারবার করবে। এই সব করতে করতেই কিন্তু অন্য কানুনগুলো তৈরি হল। এবং এটাই ধার্য হল যে, এই নীতিগুলো না মানলে পাপ হবে। আর সেই জন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে।

**হুমম...ইংরেজ আমলে তো আমরা এই রকম হতে দেখেছি। সান্ধ্য আইন নামে একটা দণ্ডবিধি ছিল। মানে যেমন এখন এক রকম শর্তসাপেক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে গ্রাফিতি করার স্বাধীনতা দিচ্ছে কিছু কিছু দেশ।**

হ্যাঁ, সান্ধ্য আইন। জগৎ-সংসারে আপনি এরকম আরও অনেক উদাহরণ পাবেন। 'সময়' ধারণা দিয়ে মানুষকে ডমিনেট করার পর এখন নতুন যুক্ত হয়েছে স্ক্রিন/মনিটর দিয়ে শাসন করা। এখন, লট্‌স অফ স্ক্রিন, সব জায়গায় স্ক্রিন, মোবাইলের স্ক্রিন, ইভেন জানালাও একটা পর্দা হতে পারে। ধরুন এমন একটা জায়গায় জানালাটা রাখা হল, যেখান থেকে আপনাকে দেখা হচ্ছে বা পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। তো, ওয়াচ টাওয়ারের বিরুদ্ধে যাওয়াটাই হচ্ছে গ্রাফিতি আর্টিস্টের স্পিরিট। গ্রাফিতি আর্টিস্ট দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান ওয়াচ টাওয়ার বা ওয়াচ ডিভাইসগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে বা এগুলোকে ডিনাই করে। মানে, সে সবার অজান্তে গোপন একটা কিছু করে গেল, তারপরে দেখল সবাই। এবং অবলোকন করে ডিস্টার্বড হল...এটাই গ্রাফিতি। মানে ডিস্টার্বেন্স তৈরি করার মধ্যে দিয়ে আপনি মাইন্ড কন্ট্রোলের বিরুদ্ধে গেলেন। আলতামিরার গুহায় যে আঁকিবুকি, তাকে কিন্তু পয়লা গ্রাফিতিকর্ম বলা হয়। মানে তারও আগে হয়তো আরও হয়েছে, কিন্তু আমাদের জানা ইতিহাসে ওটাকেই বলা যায় প্রথম গ্রাফিতি। তখন তো, আইন ছিল না। ফলে সে বনে একটা বাইসন দেখেছে, ওটাই এঁকে ফেলেছে এবং তখন কোনও বিগ ব্রাদাররা ছিল না বা থাকলেও আমি জানি না। তখন মানুষ সময়ের নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে এত বাঁধা ছিল না। জিনিসটা এভাবেই আসছে। এখন যেটা হয়েছে, যে কাজ সমাজের চোখে অবৈধ, রাষ্ট্রের চোখে অবৈধ, যদি ওইটা আপনি বারবার করতে থাকেন। এক সময় সেটা এস্টাবলিশ করে ফেলতে পারবেন। সোসাইটি তখন ওটাকেই নর্মসের মধ্যে নিয়ে নেবে। এটাই রেভ্যুলেশন বা বিপ্লব! রেভ্যুলেশন মানেই হচ্ছে— মানুষ যেটা গ্রহণ করতে চায় না, সেটার জরুরতের বয়ান হাজির করা। তো, এটা যখন আপনি বারবার করতে থাকবেন, তখন সরকার সেটা প্রথমত অনুমোদন করবে এবং দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রের নিরাপত্তার অজুহাতে আপনাকে শর্তের ঘেরাটোপে আটকে ফেলবে। যেটা, আপনি বললেন, বিভিন্ন শহর গ্রাফিতিকে বৈধতা দিচ্ছে এবং আঁকিবুকির জন্য একটা নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে বলছে, 'এখানে বসে আঁকো'। এক অর্থে এটা ভালো আবার আরেক অর্থে এটা খারাপ। ভালো এই অর্থে যে, একটা খালি দেওয়াল পেলাম যেখানে আমার মনের মতো আঁকার অধিকার পেলাম। এটাই খুব ভালো এক দিক থেকে। আবার, খারাপ দিকটা হল বিদ্রোহ করার জায়গাটা নষ্ট হয়ে গেল। আপনি সরকার স্বীকৃত হয়ে গেলেন। তখন আপনার আর নিজস্ব বক্তব্য হাজির করার সুযোগ থাকবে না। আমাদের দেশের মিডিয়ার বা পুরো বিশ্বের মিডিয়ারই মূল কথা হচ্ছে, তার দর্শক-শ্রোতাকে মনে করিয়ে দেওয়া, তুমি সব কিছু বলতে পারবে বা সব কিছু করবে, কিন্তু খাজাঞ্চিতে ট্যাক্সটা দিতে ভুলো না। ফলে, এখানে আর্ট বা গ্রাফিতি শিল্পের নিজস্ব চেতনা হারাচ্ছে, ভ্যালু থাকছে না। কাইন্ড অফ বিজনেস হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা। অর্থাৎ আপনার বিদ্রোহীসত্তা তাদের টাকা এনে দিচ্ছে। যেমন ব্যাঙ্কসির ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, ব্যাঙ্কসি এখন আর নেই, সেই ব্যাঙ্কসি! সে টাকা কামানোর রাস্তায় চলে গেছে। ব্যাঙ্কসি এখন ব্র্যান্ড আইটেম হয়ে উঠেছে। সে এখন আর্ট ওয়ার্ল্ডের একজন বিরাট সেলিব্রেটি। ফলে, রেবেল বা বিদ্রোহী শব্দটা আর তার জন্য প্রযোজ্য নয়। তার চিন্তা/কাজের মধ্যে রেবেল শব্দটা আছে, যেহেতু সে ট্রু আর্টিস্ট। কিন্তু একজন মানবসত্তা হিসেবে সে এখন আর দ্রোহী নয়।

**তাহলে, এভাবেই সিস্টেমের সঙ্গে বোঝাপড়াগুলো হয়ে থাকে?**

হ্যাঁ, এটা বলাই যায়। আমি ঠিক ক্লিয়ার না, সে কী করছে, কিন্তু ক্যাপিটালিজমের নিয়মই হচ্ছে সব কিছু বেচে দিন। এই যে আপনি সিস্টেমকে বা এর অংশকে গালি দিলেন, এখন ক্যাপিটালিজম যদি দেখে, ওই গালিটার বাজার মূল্য আছে, তখন তারা কর্পোরেশনকে বলবে, উনি আমাকে গালি দিক এবং যেন আরও গালি দেয় সেই ব্যবস্থা করো। কারণ, আমি এটা বিক্রি করব আরেক জায়গায়, তো নিখিল জাহানে এই সিস্টেমটা চালু আছে। যদি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, দেখবেন ওয়ার্ল্ডে যারা ফান্ডামেন্টালিস্ট বলে পরিচিত, তাদেরকে ফান্ডিং করার অভিযোগ আছে ক্যাপিটালিস্টদের বিরুদ্ধে। ফলে, ওদেরকে অনুমতি দিয়ে বলছে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলো, তাতে আমাদের লাভ আছে। পুরো মামলাটাই হচ্ছে মুনাফা তোলার। আর মুনাফা-লোটা সিস্টেমকে লোকসানে ফেলতে পারবেন, এরকম কোনো জায়গা বা ক্ষেত্র তৈরি করতে পারলেই আপনি বিদ্রোহী হতে পারলেন। কিন্তু যখনই তারা আপনার দ্রোহী-সত্তাটাকে কিনে নিচ্ছে বা বিক্রি করছে, তখন আর আপনি অভ্যুত্থানকারী নন। যেমন, এখন যদি আমি চে গেভারা নামটা সব জায়গা থেকে উঠিয়ে নিই তা হলে কিন্তু ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রি বা অন্যান্য পপ-ইন্ডাস্ট্রির একটা বড় ক্ষতি হবে। রিলেটেড ইন্ডাস্ট্রিগুলো দিশেহারা হয়ে যাবে বা বড়সড় গ্যাপ তৈরি হবে। বা আরেকজন আবুল বা করিমকে এখানে চে গেভারা বানানো বা কোনো নতুন রকম ফিগার বানালে ভালো হয় এরকম আলাপ করতে পারে তারা।

**যেমন বিন লাদেনকে নিয়ে হয়েছে, শুরুতে তাকে বেশ রেবেলহুড মোড়কে টি-শার্ট, অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে দিয়ে বাজারে সেল করা হয়েছে। হুইচ ওয়াজ নাথিং বাট অনলি ফর মেকিং মানি!**

হ্যাঁ, কিছু জিনিস হয়তো ছিল, কিছু রিস্কি প্ল্যান ছিল, আরও অনেক চিন্তা কাজ করছে এসবের পিছনে। এগুলো অনেক উপরের ব্যাপার, এগুলো আমরা বুঝি না একদম, এগুলো আমাদের বোঝা সম্ভব না (হা হা হা)। তবে, আমার কাছে এটা মনে হয় যে, গ্রাফিতি একই সঙ্গে রেবেল, অ্যাজ লং অ্যাজ এটা মার্কেটে ইল্লিগ্যাল আর কী! ততক্ষণ এটা ভালো, কিন্তু লিগ্যালাইজড হয়ে গেলে জিনিসটার মজাটা থাকে না। যেমন বাস্কের ক্ষেত্রেও হয়েছিল। বাস্কে গ্রাফিতি আর্টিস্ট ছিলেন। তারপর হি বিকেম ওয়ান অফ দ্য সুপারস্টার অফ হিজ টাইম। এবং সে কিন্তু তাদের শিল্পী/অ্যাক্টিভিস্ট বন্ধুদের মধ্যে

অ্যান্ডি ওয়ার্হোল

রেবেল ছিল। মানে আপনার মধ্যে যা দেওয়া হয়েছে তা আপনি নষ্ট করতে পারবেন না, যদি না চান। বা অনেকে দুর্বল মনের যাঁরা, তারা নষ্ট করে ফেলে যে, আচ্ছা, আমাকে কিছু টাকা দিচ্ছে, তাহলে উনি যেভাবে চান সেভাবে আমি এঁকে দিলাম। হয়তো ফোনে বলল, স্যর কী কালার দেব? বলে দিল, 'লাল দাও।' আবার মাঝরাতে ফোন করে বলল, 'এই লালটা একটু চেঞ্জ করে দাও তো, একটু ব্লু লাগিয়ে দাও।' আবার ভোররাতে ফোন করল, 'না, ব্লু-টাও ভালো লাগছে না। হলুদ দাও, কারণ আমার বউ বলছে হলুদটাই মানুষ পছন্দ করবে।' তারপর সকালে ফোন করে বলল, 'না, একটু বেগুনি দাও, আমার মেয়ে বেগুনি খুব পছন্দ করে।' ততক্ষণে আর্টিস্টের তো মাথা খারাপ হয়ে শেষ হয়ে যাবে। ও আর আর্টিস্টই থাকে না। এরকম জিনিসপত্র অনেক হয়। যদিও মজা করে বলছি, কিন্তু এটাই রিয়েলিটি। যদিও মজা নিজেই একটা রিয়েলিটি (হা হা হা)।

**সব সময় না হলেও মাঝে-মাঝে কিন্তু এই ঘটনায় উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। আরেকটা কমন প্রশ্ন, গ্রাফিতি আর্টিস্ট যারা আছেন, এঁদের সবাই কম-বেশি অ্যান্ডি ওয়ার্হোলকে কোট করে; মানে ওয়ার্হোলকে এত নিকটাত্মীয় মনে করার হেতু কী?**

হ্যাঁ, অ্যান্ডি ওয়ার্হোল নিউইয়র্ক সিটির জন্মের সঙ্গে, কালচারের সঙ্গে খুবই জড়িত একটা নাম। বেসিক্যালি, নিউইয়র্ক সিটিতে না হয়ে যদি বুলগেরিয়ায় হত, তাহলে অ্যান্ডি ওয়ার্হোলকে আর অ্যান্ডি ওয়ার্হোল হতে হত না। জিনিসটা হল, সে একটা সিটি আর্টিস্ট আর নিউইয়র্ক যেহেতু ওয়ার্ল্ডের ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল সিটি ফর আর্ট, সে কারণেই অ্যান্ডি ওয়ার্হোলের এত নাম ছড়িয়ে গেছে। এবং তার কাজও ইন্টারেস্টিং। ধরুন, দুশাম্পের বা লিনচেনস্টাইনের লেবেল আর্টগুলোকে তিনি তাঁর মতো করে ইন্টেলেকচুয়ালি যে আরেকটা জায়গায় নিয়ে গেছেন, সেটা তো অবশ্যই সংগ্রহে রাখার মতো একটা ঘটনা। তারপর তিনি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের ফ্যাশন স্টেটমেন্ট যোগ করেছেন, তার উইগই ছিল ৬০/৭০টা, কথা বলার স্টাইল ছিল আলাদা। এভাবে চিন্তার জায়গাগুলোকে ইনোভেটিভ ওয়েতে সে ভেঙেছে বারবার! যেমন, তার একটা অ্যাড আছে, যেটা কিছুই না, মানে অনেকক্ষণ ধরে সে শুধু জাস্ট বার্গার খায়! তারপর আরেকটা ফিল্ম আছে ১২ ঘণ্টা দুজন ঘুমিয়ে আছে, ১২ ঘণ্টার ছবি সেটা। একই কথা বারবার রিপিট করার মতো বিরক্তিকর অভ্যাস ছিল। সে তাঁর ব্যক্তিগত সাইকোলজিক্যাল সমস্যাগুলোকে ফ্যাশন এবং আর্টের মধ্যে দিয়ে কন্টেক্সচুয়ালাইজ করতে পারত। তাঁর স্টুডিওটা ছিল পুরা কালচারাল হাব। এখান থেকেই ভেলভেট আন্ডারগ্রাউন্ডের মতো ব্যান্ড সহ আরও অনেক কালচারাল ইনিশিয়েটিভের সৃষ্টি হয়েছে। আমি ঠিক জানি না। ওখানে বিভিন্ন ফিল্মমেকাররা গেছে, অদ্ভুত অদ্ভুত ফিল্ম বানিয়েছে। যেগুলো একেবারে আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করেছে। আর্ট দুনিয়ার রেগুলার সমঝদারির পরিসরগুলি ভেঙে ভেঙে সে আর্টে নতুন জিনিসপত্র সংযোজন করেছে।

**ওই সময় আরেকজন ছিলেন না নিউইয়র্কে? ওঁর নাম ভুলে গেলাম, যিনি জেব্রার মোটিফে হেড-স্পিনিং সব গ্রাফিতি-সহ ইনস্টলেশনের কাজ করেছে...।**

কোন পপ আর্টিস্ট?

**নামটা তো মনে আসছে না। বাই দ্য ওয়ে, আধুনিক চিত্রকলা/শিল্প যদি প্রতিবাদের মধ্যে থেকেই জন্ম নিয়ে থাকে, তবে আধুনিক চিত্রকলা চর্চার মুখে অরাজনৈতিক মুখোশটা কেমন করে সেঁটে গেল? গ্রাফিতি লেখকরা দাবি করেন যে, প্রচলিত/আধুনিক আর্টের কেনো অরগ্যানিক এক্সপ্রেশন নেই, বরং আছে হেজিমোনিক বা আধিপত্যবাদী প্রকাশভঙ্গি, যা সমকালীন রাজনৈতিক টানাপোড়েন গায়ে না মেখেই দিব্যি আর্টের প্র্যাক্টিস করে যাচ্ছে। তথাপি, গ্রাফিতি লেখকরা উন্মুক্ত এভিন্যু ছেড়ে যখন গ্যালারিতে নিজেদের পসরা সাজিয়ে বসে, তখন তাদের 'অ্যাক্টিভিজম থ্রু আর্ট' কথাটাকে খেলো মনে হতে থাকে। আর গ্যালারিতে স্পেস পাওয়ামাত্র দুই পার্টিই আচরণ শুরু করে বন্দুক হারিয়ে ফেলা বুলেটের মতো। এটাকে কি মডার্ন আর্টের সাইড এফেক্ট বলবেন?**

গ্রাফিতিও তো আসলে একটা পপ কালচার। মানে এটা তো সাম হাউ পাবলিক কালচারে ইনপুট দেয়। এবং মডার্ন আর্ট ফর্মও বটে। তো, মডার্ন আর্টের বিষয়টা হচ্ছে যে, ইন্টেলেকচুয়ালিজম অর্থাৎ ব্যক্তি-মনীষা বা বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা করা। দুনিয়ার কামকাজ ব্যাখ্যায় শুরু থেকেই মর্ডানিস্টরা সোসাইটির মাইক্রো লেভেলে কাজ করা শুরু করে এবং লাইফস্টাইল, রিলিজিয়ন, কালচারের বাজারে যেসব নৈতিকতা, মূল্যবোধ, রীতি-প্রথা আসমানি কেতাবের (সর্বোচ্চ ধর্মগ্রন্থ) মর্যাদায় আসন নিয়ে বসেছে, সেই সব ইস্যুকে প্রশ্ন করতে থাকে। এটা তো জানা কথা, বুদ্ধিমত্তা বা যুক্তির লেন্স দিয়ে সব কিছুকে দেখাই হচ্ছে মডার্ন আর্টের উদ্দেশ্য-বিধেয়। যেমন, প্রি-মডার্ন আর্টে পৃথিবীকে দেখা হত (ধর্মীয়) বিশ্বাসের ম্যাগনিফায়িং গ্লাস দিয়ে।

মানে, বিশ্বাস এবং মনীষা— এই দু'টোর পার্থক্যই হল মডার্ন আর্ট ও প্রি-মডার্ন আর্টের মধ্যে ফারাক। প্রি-মডার্ন আর্টের রমরমা টাইমে (ধর্মীয়) বিশ্বাস শিল্পচেতনাকে কোনো একটা নির্দিষ্ট গন্তব্যে ড্রাইভ করত। মানে ধরুন, আর্টের মধ্যে দিয়ে হাইপোথেটিক্যাল ট্রুথ রচনা করার চেয়ে ফ্যান্টাস্টিক্যাল ট্রুথের ডেমোনস্ট্রেশনটাই মেইন গোল ছিল। সেই সময়কার জীবন-রাজনৈতিক বাস্তবতায় পাওয়ার স্ট্রাকচারের একদম মর্মস্থলেও গদি পেতে বসেছিল (ধর্মীয়) বিশ্বাস। আবার, দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী এই রিলিজিয়নকে সে সময়ের জনগণ যেভাবে ভক্তি জানিয়েছে, সেই অর্থে জনগণ কিছুই পায়নি। বরং নির্যাতন, অত্যাচার, সংঘাতের শিকার হয়েছে। যেমন বলা যায়, উইচ হান্টিং বা ডাইনি শিকারের নামে অনেক নারীকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে ইউরোপ জুড়ে। খোঁজ করলে দেখা যাবে, নিহতদের মধ্যে অনেকেই ধর্মীয় অনুশাসনের অযৌক্তিক বিধিমালার সমালোচনা করেছিল বা অল্টারনেট লাইফস্টাইল প্র্যাক্টিস করতে চাইত। রিলিজিয়নের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রক্তারক্তি এসেছে। মডার্ন টাইমে আর্টিস্টরা পরলোকের ইশারা ব্যবসাকে সাইড করে, ইহলোক থেকে নিজেদের  মতো করে রেফারেন্স সাজিয়ে কাজের প্র্যাক্টিস শুরু করে। তবে এখানে একটা কিন্তু আছে। মানে, এই যে প্রি-মডার্ন আন্ডারস্ট্যান্ডিংকে চ্যালেঞ্জ করে মডার্ন কনসেপ্টের আমদানি হল বটে, এরপর শিল্পচর্চার এই ধারা কোথায় গিয়ে ঠেকবে? এ প্রশ্নে বলা যেতে পারে,

অ্যান্ডি ওয়ার্হোল পপ আর্ট : ১

নির্দিষ্ট সময়ের প্রেক্ষিত অনুযায়ী মডার্ন আর্টের স্ট্যান্ডটা ঠিক আছে। বাট, অ্যাট দ্য এন্ড একটা সার্টেন টাইমের পর আপনাকে আবার রিটার্ন যেতে হবে শূন্যে বা শুরুতে। মানে বৌদ্ধিক অবস্থান থেকে চলে যেতে হবে আত্মিকবাদ বা মায়াবাদে। তাহলেই আর কী, কারেন্ট আর্ট মার্কেটের ধুনফুনগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। আমি বলি যে, শিল্প বা সৃষ্টিসুখের স্বর্গে এন্ট্রির প্রশ্নে ইন্টেলেকচুয়ালিজম স্বর্গের দরজায় কড়া নাড়ার সুযোগ দিলেও, দরজা খোলার মন্ত্রের জন্য যেতে হবে স্পিরিচুয়ালিজম বা মায়াবাদের কাছে।

**মানে জার্নিটা যদি শুরু করতেই হয়...**

হ্যাঁ, তো মডার্ন আর্ট হচ্ছে নকিং অন দ্য হ্যাভেন্‌স ডোর। এখন মানুষের ভিতর যা আছে, সেটা তো আসলে আধ্যাত্মিক জিনিস। কারণ মানুষ তো আধ্যত্মিক প্রাণী। তো, ওটা থেকেই বিভিন্ন জিনিস বেরিয়ে আসে। যেমন দেখবেন, দালির মধ্যে চলে আসছে, পিকাসোর মধ্যে চলে আসছে এবং ওই স্পিরিচুয়ালিজমের চর্চা ছিল বলেই কিন্তু তারা এত উপরে উঠতে পেরেছে। যারা পারেনি তাদের কিন্তু অনেকের নামই নেই। এবং যাদের মধ্যে ছিটেফোঁটা আছে তারা মোটামুটি মাইনর আর্টিস্ট। আর যারা স্পিরিচুয়ালি বার্স্ট আউট করেছে মডার্ন আর্টের মাধ্যমে বা চিড়িং করে লাফটা দিয়ে ফেলেছে, তারা কিন্তু উপরে উঠে গেছে। এটা খুবই ছলচাতুরিহীন একটা বিষয়, শুধু অধ্যাত্ম আর বুদ্ধিবৃত্তির খেলা। আলো আর ছায়া, আর কিছু না।

অ্যান্ডি ওয়ার্হোল পপ আর্ট : ২

**কিন্তু আমরা দেখেই থাকি সমাজচর্চিত পছন্দের তালিকায় বুদ্ধিবৃত্তিকবাদ বা ইন্টেলেকচুয়ালিজম নিয়ে মাতামাতি বেশি আর অধ্যাত্মবাদ বা স্পিরিচুয়ালিজম যেন দূরের শঙ্খনাদ...**

হুম্‌ম...ইন্টেলেকচুয়ালিজমের একটা ডিজিজ আছে তো আমাদের মধ্যে। যাঁরা শিক্ষিত, তাঁরা অনেকেই এই ডিজিজে সাফার করছেন। বেসিক্যালি, এটা একটা বাহ্যিক চেহারা, মানে ইন্টেলেকচুয়ালিজমটা। আমি বলতে চাইছি যে, ইন্টেলেকচুয়ালিজমের দরকার আছে। কারণ আপনি চাবি ছাড়া দরজা খুলতে পারবেন না। কিন্তু ওখানে যদি আটকে থাকেন, তো আপনি যখন চাবি ঘোরাচ্ছেন তখন খটখট শব্দ হবে, কিন্তু খুট করে তালা খোলার শব্দটা দূর ইশারাতেই রয়ে যাবে। যারা ইন্টেলেকচুয়ালিজমের চর্চা করে তাদের ক্ষেত্রে, চাবির খটাখট শব্দটাই ধ্বনিত হচ্ছে মাত্র। ওই যে রাজস্থানের ফতেপুর সিক্রির দরজাগুলো খুলে গেলে যেমন আস্তে আস্তে ক্যাঁ-চ করে একটা জবরদস্ত শব্দ হয়, ওই রকম কিন্তু হচ্ছে না! আবার ধরুন, স্পিরিচুয়ালিজমকে অপলাপ বা অভাববোধক প্রস্তাবের জায়গা থেকে দেখাটাও এক ধরনের বুদ্ধিজীবীদের কমন প্র্যাক্টিস। এগুলো আসলে ম্যালপ্র্যাক্টিস, বাংলায় যেটাকে বলে কদাচার। যা কনফিউশন আমদানি করে। আবার অনেকে আছে দু'টোকে একসঙ্গে মিলিয়ে ফেলে। তারা স্পিরিচুয়ালিস্ট প্র্যাক্টিসের মধ্যে ইন্টেলেকচুয়ালিজমের বিধর্মী বিষয়-আশয়গুলো জড়ো করে ফেলে, ফলে দু'টোর কোনোটিই ওয়ার্ক আউট করে না। এরকম অনেক লোক আছে, মানে আমাদের মধ্যেই আছে, আমি নাম বলব না। মানে, মাথা খারাপ হয়ে যায় তাদের! দে ক্যান নট রিলেট। তো, আপনাকে খুব স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে যে, কোনটা কী অর্থ বোঝায়? কারণ, এগুলো খুব কুদরতি জিনিস। এও ভাববার অবকাশ নেই যে, কোনো একটি কম বা বেশি জরুরি। ইন্টেলেকচুয়ালিজমও খুবই প্রতাপশালী বিষয়! আর স্পিরিচুয়ালিজম মানে তো নিখিল জাহান বা সমগ্র বিশ্ব। এখন আপনি আর কী করবেন... এইখানে 'মানুষ' আপনি তো কিছুই না! (হা হা হা)।

**হা হা হা— যাই, নিখোঁজ হওয়ার আগে হারানো বিজ্ঞপ্তি প্রচারের রিকশা আর মাইক ভাড়া করি গিয়ে...!**

তারপর ধরুন, ইন্টেলেকচুয়ালিজমের যে আত্মশ্লাঘা আছে তা কিন্তু 'ইগো'র ব্যায়াম জারি রাখার জন্য নয়। বরং 'ইগো'র ল্যাবিরিন্থ থেকে বের হবার জন্য। 'ইগো'র মায়ায় আটকে গেলে আপনি কিন্তু শেষ। কারণ, ইন্টেলেকচুয়ালিজম মেরে ফেলে সব কিছু। কারণ, আপনি সবসময় বিচার করছেন, অ্যানালিসিসের মাধ্যমে বিকারতত্ত্বের নিদান হাতড়ে ফিরছেন এবং অপরকে দোষারোপের মধ্যে দিয়ে দিবস-রজনী উদ্‌যাপন করে যাচ্ছেন। আপনি কিন্তু একরৈখিকভাবে দোষ দিচ্ছেন। আপনি দেখবেন যে, অনেক লোক সারাক্ষণ দোষ দিতে থাকে, কমপ্লেন করতে থাকে। কিন্তু কমপ্লেনিংয়ের পরে রিয়ালিটিটাকে অ্যাকসেপ্ট করার যে ব্যাপারটা আছে— মানে গ্রহণ করে আমি চুপ করে গেলাম। এই যে জিনিসটা, এইটাই টোট্যালি মিসিং। আবার এই দু'টো ব্যাপারের সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে পলিটিক্স। পলিটিক্সে আরও খারাপ ঘটনা ঘটে। পলিটিক্স কতিপয় মানুষের উপর সওয়ার হয়ে স্বার্থসিদ্ধিলাভের আশায় ইন্টেলেকচুয়ালিজম আর স্পিরিচুয়ালিজম—দু'টোকেই কাজে লাগায়। যখন যেটাকে দরকার হয়। যেমন, আধ্যত্মিক

গুরুকে কিছু টাকা দিয়ে দিল, সে হেনতেন একটা গ্যাঞ্জাম পাকিয়ে দিল। আবার প্রয়োজনে কোনো বুদ্ধিজীবীকে খরিদ করে একটা পলিটিক্যাল মুভমেন্ট করে ফেলল বা মুভমেন্টের গলা টিপে মেরে ফেলল। মানে, এটা হচ্ছে, যাকে বলে আসল 'ইভিল পাওয়ার'। বেসিক্যালি খেলাটা হয় 'ইভিল পাওয়ার' আর 'গুড পাওয়ারে'র মধ্যে। বা স্পিরিচুয়াল পাওয়ার এবং নন-স্পিরিচুয়াল পাওয়ারের মধ্যে। ফাইটটা এই দু'টোর মধ্যেই মানে লাইট অ্যান্ড শেডের মতো আর কি। এর ফলে সর্বদা সোসাইটিতে একটা কোল্ড ওয়ার বিরাজ করে। আর জানেন তো, কোনো ক্রাইসিসের হাজিরা না থাকলে নতুন কোনো সম্ভাবনা তৈরি হয় না। এ কারণেই একটা যুদ্ধ না হলে ভালো আর্টিস্ট, ন্যাশনাল হিরো বের হয় না।

**ভালো গান বের হয় না...**

তার মানে হল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটের যুদ্ধ, মানে একটা মৃত্যুময় অন্ধকার লাগবে আলোর অস্তিত্ব বোঝার জন্য। এই সবের সুলুক-সন্ধানটা অত্যন্ত জটিল আর কি; তবুও আমি ভাসাভাসাভাবে বলে দিলাম।

**তবে প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষিত থেকে অনেক সহজ করে বলেছেন বিষয়গুলো...**

আসলে ব্যাপারগুলো সহজ ও সাবলীল, কিন্তু দেখালে বা দেখতে চাইলে অনেক জটিল করেও দেখানো যায়। আপনি যদি একটা প্রাসাদের ভিতরে ঢোকেন তা হলে এর ইন্টেরিয়র আপনার অনেক জটিল মনে হবে। কিন্তু একটা ঈগল পাখির উপর যদি ওঠেন তাহলে বার্ডস আই ভিউ থেকে প্রাসাদটা অজটিল একটা জিনিস বলেই মনে হবে।

**অর্থাৎ, নিজেকে পরিস্থিতি থেকে দূরে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা একটা বিশেষ সামর্থ্য, যা সবার থাকে না। আর জার্নিটা সবাই নিতেও চায় না মনে হয়। কারণ, জার্নিটা নিতে গেলে যেমন আমি দেখি যে, আশু বাস্তবতা বা ইমিডিয়েট রিয়েলিটিকে কখনও কখনও ফেস করার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়, নতুবা অকপটভাবে সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হয় অথবা নিতে পারতে হয়। এদিকে, মানুষ তথাকথিত দূরদর্শী চশমা পড়ে তথাকথিত ভিশন বা কাল্পনিক বাস্তবতা হাসিলের জন্য ইমিডিয়েট বাস্তবতাকেই বরং অগ্রাহ্য করে থাকে। মানে, আমরা তো বাড়ি-ইসকুল থেকে এটাই শিখে আসছি, যে একটা ভিশনকে সামনে রেখে ওই ভিশনের জন্য ফাইট করব।**

এখানেই তো খামতিটা দেখা দেয়। ধরুন, আপনি এখন চিন্তা করছেন রাশিয়ান বিপ্লবের কথা। এদিকে আপনার সমস্যা হচ্ছে অন্য। আপনি চিন্তা করছেন ইসলামিক বিপ্লবের কথা। এদিকে আপনার সমস্যা হচ্ছে একেবারে ভিন্ন। যেমন, দলীয় রাজনীতি, হেনতেন এই সব আর কি। তো, এইগুলো দিয়ে তো এভাবে হয় না। এখন আপনার সমস্যা হচ্ছে ৫০ টা লোককে আমি কীভাবে সামলাব।

**আর এই ৫০ টা লোক তো ৫০০ মিলিয়নের স্যাম্পলও না। সুতরাং, চিন্তা করে তো হবেও না কিছু, ঝামেলা আরও বাড়বে। নতুন আরও একটা ঝামেলা তৈরি হবে। যাই হোক, ঝামেলা থেকেই মনে পড়ে গেল—গ্রাফিতি আর্টিস্টদের টার্গেটই থাকে সিস্টেমের সিংহাসনে বসে যারা সাম্রাজ্যবাদী কোকাকোলা পান করে তাদের গায়ে ঝামেলার ঝোল লাগিয়েদেওয়া। মানে, জেনারেল পাবলিকদের যারা এটা নেই, ওটা নেই-এর দৌড়ের উপর রেখে মজা লোটে, তাদের সানডে-মনডে ক্লোজ হয়ে যায় এইসব গ্রাফিতির প্রকোপে। অন্যদিকে আমজনতার নজরে তারা বেশ আদৃতই হয়...**

জেনারেল পিপলদের খুব একটা সমস্যা নেই বলেই আমার মনে হয়েছে। ইউরোপে তো সমস্যা নেই-ই, দে এনজয় ইট। আর বাংলাদেশে...বাংলাদেশ তো আসলে গ্রাম পর্যায়ে পড়ে আছে। মানে ঢাকাও তো একটা বড় গ্রাম আর কী! তাই, এখানকার সব কিছুই নতুন, সব কিছুই আপত্তিজনক আবার সব কিছুই গ্রহণযোগ্য।

**তাহলে কেমন করে কী হয় এখানে?**

এখানে কোনো আগা-মাথা নেই। যেমন কালকে আপনার কাজ দেখে কেউ বলল, এটা তো কিছুই হয়নি। তার পরের দিন বলবে যে, এর চাইতে ভালো কিছু হয় না। এখানকার মানুষের বোঝাপড়া বা সমঝদারিটা একটা ঘোরের মধ্যে আছে। মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের যে ম্যাচিওরিটি বা পরিপক্কতা, ওটা তারা এখনও অ্যাচিভ করে উঠতে পারেনি। আর্টের যে একটা ম্যাচিওরিটি আছে ওটার আশেপাশেও যায়নি তারা। আর্ট বলতে এখানে যেটুকু আছে বা চলে তা এতটাই ক্ষমতার খেলা দিয়ে শোভিত যে, সেটার মধ্যে আর্টের ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এখানে আর্ট হিস্ট্রি নেই, কিন্তু পাওয়ার প্লে আছে। আর্ট প্রমোটারই নেই, পাওয়ার প্লে আছে। মানে রাজনীতি আছে, কিন্তু অন্য কিছুই নেই। এটা হচ্ছে শূন্যতার আদান-প্রদান বা শূন্যতা নিয়ে এক ধরনের খেলা— 'দেখো কত ধরনের শূন্যতা আছে আমাদের কাছে।' কিন্তু এখানেই শেষ নয়। যেমন ক্যাপিটালিজম আছে, ক্যাপিট্যাল নেই। কালচারাল প্র্যাক্টিস আছে, কালচার নেই। জনগণের মধ্যে কালচারের সফ্টনেসটা ঢুকছে না। কালচার বারবার পলিটিক্স হয়ে যাচ্ছে আর ভায়োলেন্সে রূপান্তরিত হচ্ছে। আর্টিস্ট, গায়ক, সাহিত্যিক সবার মধ্যে ভায়োলেন্ট অ্যাক্টের চর্চা দেখা যায়! সারভাইভাল অফ আনফিটেস্ট আর কী! মিডিওকার লোকজন ফ্রন্টে চলে আসছে। রিয়েল ট্যালেন্টের ফাইট করবার ক্ষমতা না থাকায় শ্যাডো আকারে প্রকাশ বা নষ্ট হচ্ছে। হজরত আলি (রহ.)-এর একটা উক্তি আছে— 'আপনি যদি দুনিয়ার বিষয়ের সঙ্গে মাখামাখি করতে চান, তবে অবশ্যই সারমেয়দের সঙ্গে হাতাহাতি করতে হবে।' এটা ব্যাপক অর্থে উনি বলেছেন। কিন্তু এটা একটা নাবালক অজ্ঞ সমাজের পক্ষে একমাত্র সত্য। সোসাইটিতে কালচারাল ইনফরমেশনগুলো যথেষ্ট দেওয়া নেই। একজন জয়নুল

আবেদিন বা কামরুল হাসান ছাড়া আর কোনো আর্টিস্টের নামই শোনেনি কেউ। পিকাসো ছাড়া কোনো শিল্পীকে সে হয়তো চেনেই না। পশ্চিমে বিষয়টা এরকম নয়। কালচারাল ইনফরমেশন ছোটবেলা থেকেই তারা পায়। এশিয়ার উন্নত দেশগুলোতে বিষয়টা অনেক অ্যাডভান্স। সর্বোচ্চ শিল্প তৈরি হয় একটা সম্পূর্ণ অর্গানিক প্রসেসের মধ্যে দিয়ে। মানে, এক ধরনের হাইপার ড্রাইভ, যেখানে প্রথমে কালচারাল টাইম পরে টাইমের হোলিস্টিক ফেনোমেনাতে শিল্প নিজের টাইম অ্যান্ড কালচার তৈরি করে। আর তখনই 'গ্রেট আর্ট' শব্দটা ইউজ করা হয়। গ্রেট আর্টিস্ট তৈরি হয় চৈতন্যের বিপুল অর্গ্যাজমিক-বায়োসাইকিক অভিযানের মধ্যে দিয়ে। এটা প্রকৃতির একটা মহাশক্তি বা গ্র্যান্ড এনার্জি, যা বহু জন্মের ডিজায়ার বা অভিলাষ বা কাম-লালসাকে একত্রিত করে। ক্রিয়েটিভিটির চূড়ান্ত কোনো বিস্ফোরণ অন্য কোনোভাবে সম্ভব নয়! তা ইভ্যুলুশন প্রসেসের মধ্যে দিয়ে হতে হবে। সিম্পলি বাঁদর থেকে মানুষ 'মানুষ' হল। এরপর সে সুপার হিউম্যান হতে চাইছে। ফিউচারে সে অন্য কোনো প্রজাতিতে নিজেকে রূপান্তর করবে। যেমন ধরুন, ইঞ্জেকশন দিয়ে শরীরের মধ্যে এম্পটি স্পেস বা বাতাসের শূন্যতা ঢুকিয়ে দিল, ফলে সে কিন্তু শূন্যতার অংশ হয়ে গেল। আর শূন্যে মিলিয়ে যেতে চাওয়াটাই হল অস্তিত্বের সর্বশেষ এবং সর্বপ্রথম অনুচ্চারিত ডিজায়ার!

**সেটাই! শূন্যতার খেলাই চলছে এখানে...**

শূন্যতা ভালো, যদি ওই শূন্যতা দেখাতে পারেন। এখানে যেটা হচ্ছে তা হল পরিণাম-চিন্তাশীল শূন্যতা। এক কথায় ডিস্টার্বড শূন্যতা। একটা টিনের কৌটোর মধ্যে যে শূন্যতা তৈরি হল, ওই শূন্যতা নয়। ফ্যাক্টরি মেড যে শূন্যতা... হা হা হা।

**সিন্থেটিক শূন্যতা আর কী। আপনার সঙ্গে কথা বলে যেটা মনে হচ্ছে ব্যাঙ্কসির একটা গ্রাফিতি আছে, যেখানে মোনালিসার কাঁধে একটা রকেট লঞ্চার...**

এই ছবিটার একটা মজার কাহিনি আছে। ব্যাঙ্কসির ওই গ্রাফিতির মোনালিসার মুখে আরেকটি লোক দাড়ি লাগিয়ে ওকে লাদেন বানিয়ে দিয়েছে। তার পরের দিন পুলিশ এসে আবার ওটা মুছে দিয়েছে। এটা একটা গল্প। ইন্টারেস্টিংও বটে। খেয়াল করুন, মোনালিসা ইউরোপের লাবণ্য-সৌন্দর্য-প্রহেলিকার এক ধরনের প্রতীক। ওইটার সঙ্গে লাদেন এক অর্থে ইসলামি বিপ্লবের প্রতীক কিন্তু। হোক নেগেটিভ, বাট এটা একটা ক্যারেক্টার, যেটা অধুনা বিশ্বে বিদ্রোহী-সত্তার মর্যাদা পেয়েছে। এর নেগেটিভ-পজেটিভ মিনিং আমি জানি না। ওটা হয়তো আরও পরে বোঝা যাবে, আসলে কী হয়েছে। ক্যারেক্টারটা আবার মার্কেট, মিডিয়ার কাস্টম মেডও হতে পারে, আমি জানি না। সেটারও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু প্রতীক হিসেবে দেখলে মোনালিসা হচ্ছে ইউরোপের বিউটি ও মিস্ট্রির প্রতীক। আর এদিকে লাদেন হচ্ছে মুসলিম জাগরণের প্রতীক। তো দু'টিই কিন্তু ইভেনচুয়ালি একসঙ্গে হল। ব্যাঙ্কসি বলছে যে, আমাদের বিউটি বা মিস্ট্রির হাতে এখন রকেট লঞ্চার। আর এরা বলছে যে, আমাদের ইসলামিক বিপ্লবের যে প্রতীক, তার হাতে এখন রকেট লঞ্চার। আবার, সে কিন্তু ইউরোপের বিউটি নিয়েও আছে। দুই গ্রুপ এই যে অদ্ভুত একটা ডায়লগ ক্রিয়েট করছে এখানে না বুঝেই, এই ব্যাপারটাই জোশ।

**এই টাইপ 'শিল্প-সন্ত্রাসে' পশ্চিমিরা চমকে গেলেও ভড়কে হয়তো যাচ্ছে না। লিভিংরুমে হ্যাং হয়ে থাকতে দেখা মোনালিসার এমনতর রূপ-বৈচিত্র্য তাদের অ্যাপলিটিক্যাল মামদোবাজিকে উলটো চার্জ করে। ব্যাঙ্কসির মতে, গুম হয়ে যাওয়া চেতনার বাজারে হট্টগোল পাকাতে হলে দরকার ভদ্রলোকদের মননের অন্দরমহলে ক্যাওসের গিট্টু লাগিয়ে দেওয়া...**

হ্যাঁ, তা তো বটেই। আমাদের সাইকিতেও তো আছে। মানে, মোনালিসার ছবি হায়ার মিডল ক্লাস বা লোয়ার মিডল ক্লাস বা আপার ক্লাস— যাই বলেন না...একটা বড় (শিক্ষিত) জনগোষ্ঠীর ঘরের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে বিগত সময় বা এই কালেও। ইন্ডিয়া, চায়না বা হোল ওয়ার্ল্ডের মানসিক-প্রণালীতেও তা আছে। কাইন্ড অফ আইকন, মানে একটা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো জ্যামিতিক ফিগার। সব জায়গায় সে আছে। পার্ট অফ দ্য আরবান কালচার বলা যায়। একই সঙ্গে সর্বজনীন শহুরে সংস্কৃতির অংশ বলা যায়। নাম নিলেই সবাই বলে, ও মোনালিসা, হাউ বিউটিফুল! এই যে বিউটি ও মিস্ট্রিকে কেন্দ্র করে ওটাকে তৈরি করা হয়েছে, সেটা সব কালচারের মধ্যেই ছড়িয়ে গেছে।

**ঢাকায় কার্টুনিস্ট-ডুয়ো মানিক-রতন বনানী ব্রিজের গোড়ায় লাগোয়া গেস্ট হাউসের দেওয়ালে একটা গ্রাফিতি করে। গ্রাফিতিটি ছিল ১৯৭১-এ কনসার্ট ফর বাংলাদেশের পোস্টারে ব্যবহৃত ক্ষুধা-দারিদ্র্যক্লিষ্ট শিশুটিকে অবলম্বন করে আঁকা। তো, ওয়ান ফাইন মর্নিং দেখা গেল, কেউ একজন গিয়ে ব্যাঙ্কসির 'গার্ল উইথ আ রেড বেলুন'-এর মতো একটা বেলুন এমনভাবে এঁকে দিয়েছে যে, মনে হচ্ছে যেন বেলুনটা শিশুটির হাত থেকে ছুটে যাচ্ছে! এখন, আমার প্রশ্ন হল, আর্টের উপর আর্টের যে কারিকুরি সেইটার মর্মমূলে কী আছে?**

আর্টের ক্ষেত্রে আলোড়ন জিনিসটা ঠিক পোস্টারের মতো বা টিভি অনুষ্ঠানের মতো নয়। বা কারো ভাষণের মতো নয়। বলতে পারেন এটা অনেক সাটল বা অস্থূল। যেমন একটা ইমেজ আমি দেখলাম বা একটা মাটির ঢেলা বা পাথরের ছোট অংশ দেখার মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ, ওখানে একটা ব্যক্তি মানুষের মন থাকে। আর্টে খুব সহজেই হিউম্যান মাইন্ডটা দেখা যায়। মানে অনেক ভিজিবল বা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান আর কী। আসলে এই জিনিসটা জীবন্ত— আর্টটা। ওখানে যে বাচ্চটা আঁকা হয়েছে, সেটা কিন্তু আর শুধু আঁকা হিসেবে অবলোকনের অপশন নেই! যেন বা, একটা রিয়েল পার্সন ওখানে বসে আছে। শিল্পীর হাতের আঁকা যতই খারাপ হোক, সে যদি একটু এনার্জি অ্যাড করতে পারে তো ওটা রিয়েল হয়ে যাবে।

**এই ক্ষেত্রে এনার্জির পরিচলন কী উপায়ে ঘটে?**

আর্টিস্টের এনার্জি যখনই তার কাজের মধ্যে চার্জড হয়, তখনই তা আর্টকে বাস্তবিকই আন্তরিক করে তোলে। আমাদের আর্টের ক্রাইসিসটা হচ্ছে, এনার্জিটা ডিসচার্জড করতে পারা বা না পারার সক্ষমতার উপরে। এই দু'টো ইস্যু নিয়েই আর্টিস্টের খেলা। যে এনার্জি দিতে পারে কাজের মধ্যে দিয়ে সে আর্ট তৈরি করতে পারে, যে পারে না সে আর্ট করে উঠতে পারে না। যে এনার্জি দিতে পারে সে একটা বিন্দু দিয়ে সাদা ক্যানভাসে বুঝিয়ে দিতে পারে যে, আমার এনার্জি চলে গেছে। আর যে পারে না, সে আট বছর ধরে পেইন্টিং করে দেখাল যে, ডেড এন্ডে দাঁড়িয়ে আছে, কিছুই নেই ওটার মধ্যে।

**আপনি আমাকে একটা আর্টিস্টের কাজ ধরিয়ে দিয়েছিলেন, যে কি না পোলকা ডট নিয়ে কাজ করত, জাপানিজ আর কী... নামটা যেন কী...**

হ্যাঁ, কুশমা। ও কিন্তু খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল। ষাটের দশকের অনেকের মধ্যে যেমন, ওয়ারহোলের উপর তার ভালো প্রভাব ছিল। তারপর, ও নিউইয়র্ক থেকে চলে যায় জাপানে। মানসিক অশান্তিজনিত কারণে ভর্তি হয় একটা অ্যাসাইলামে। এখনও সেখানেই থাকে। ওই যে ডট নিয়ে ওয়ার্হোলের যে রিপিটেশন থিওরি ওটা কুশমার থেকে নেওয়া। কুশমা খুবই সাইকেডেলিক, অন্যরকম মানে সুররিয়েলিক। অন্যরকম একটা মাইন্ডফ্রেম আছে ওর। আর জাপানিদের তো বোঝেনই— 'দে আর ভেরি মিস্ট্রিরিয়াস।'

**হ্যাঁ, খুব চুপচাপ থাকবে। কথা বলবে না।**

ওদের কালচারের মধ্যে মিস্ট্রি বিষয়টা ডিপলি রুটেড। যেটা আর কী বিয়ন্ড দ্য কনসেপ্ট অফ গুড অ্যান্ড ব্যাড। আমরা তো ভালো-মন্দের বাইরে কোনো কিছু আর ভাবি না। কিন্তু এই বাইনারি
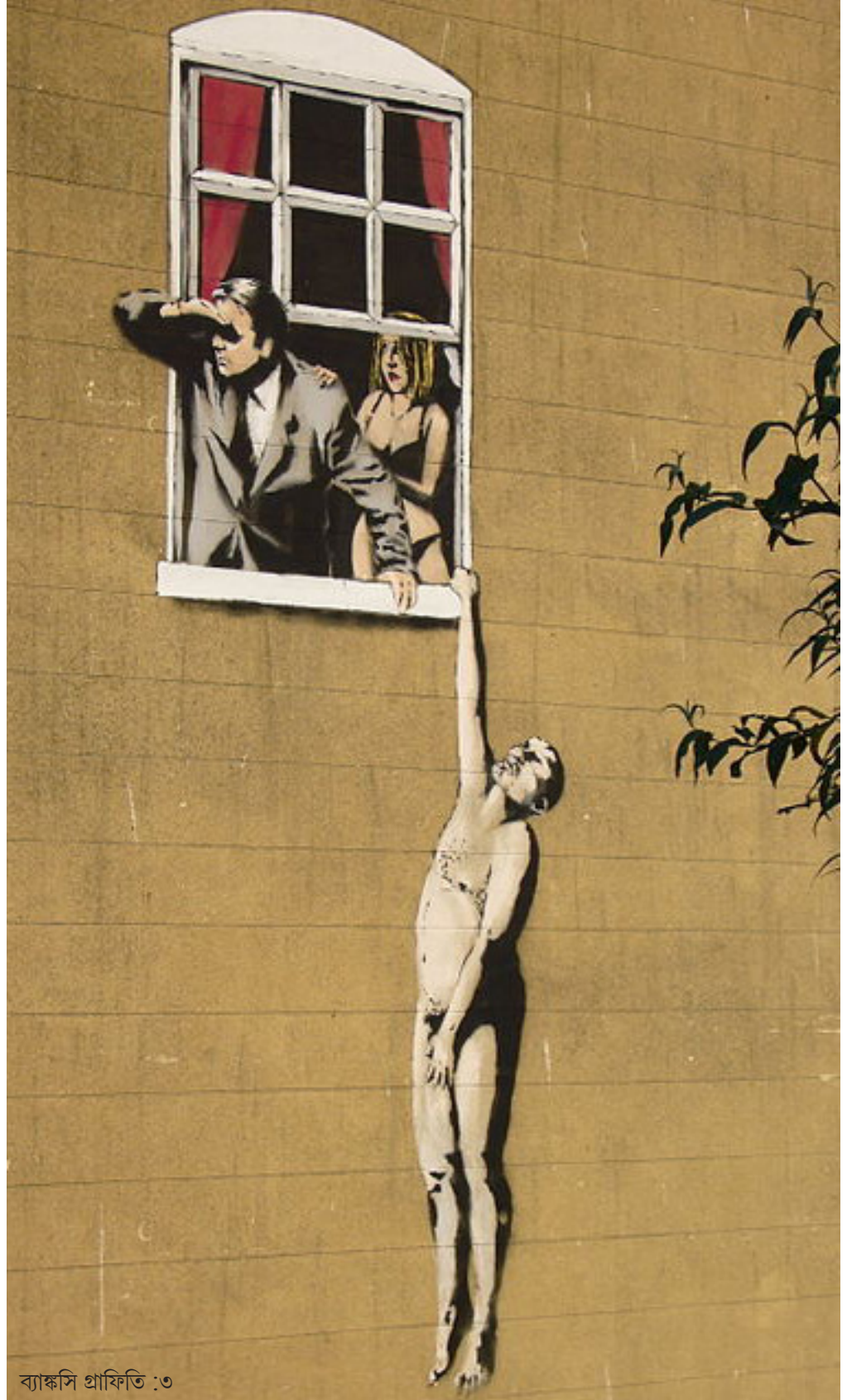
ব্যাঙ্কসি গ্রাফিতি :৩

অপোজিশনের বাইরেও অনেক জায়গা আছে। যেগুলো নিয়ে কেউ কাজ করে না।

**বাইনারি অপোজিশন তো সামাজিক মানুষের অন্যতম অ(সামাজিক) অজুহাত। এই বৈপরীত্য জোড়ের মধ্যে থেকে সে তার কমফোর্ট জোনের আয়েসের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে আরামসে...**

এটা সহজ নয়, মানে প্রচলিত ধারণার বাইরে গিয়ে কথাকথিত নিত্যতাকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা হয়তো করা হয়ে থাকবে। কিন্তু সেটাকে প্রোমোট করা হবে না সেভাবে। এইজন্য আপনাকে এটুকুই বোঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীতে যে কোনো জিনিস হয় ভালো নয়তো খারাপ।

**ব্যক্তি মানুষও যেমন সামাজিক পরিসরে এগুলো সেইভাবে এক্সপ্লোর করে না বা যাপনের স্টিরিওটিপিক্যাল চক্করে পড়ে করাও হয় না, তেমনই রাষ্ট্রও তার সর্বজন বা পাবলিকদের প্রচলিত ধারণার বিপ্রতীপ কোনো চর্চাকে যেকোনো অর্থে স্পনসর করে না।**

আর এগুলো করতে দেওয়াও যাবে না। সিটিজেনকে বেশি ইন্টেলিজেন্ট করে তোলা যাবে না। তা হলে, ডমিনেট করতে অনেক সমস্যা দেখা দেবে। তাই, ইন্টেলিজেন্স কম থাকাই ভালো।

**আপনার কথার সম্পূরক হিসেবে আমার যেটা মনে হচ্ছে— গ্রাফিতি বা পপ আর্টের ঝক্কিটা হল, এটা যে কোনো সময় ফ্যাশনে টার্ন আউট করতে পারে এবং ফ্যাশন হচ্ছে এক রকমের গিমিক...**

না, না। ফ্যাশনকে আমি আসলে ওইভাবে দেখি না। ফ্যাশন অনেকটাই আর্ট এবং ফ্যাশনে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, ফ্যাশন এত ক্রিয়েটিভ জিনিস আর এত ভাবে হচ্ছে এখন সারা ওয়ার্ল্ডে, ফলে ফ্যাশন বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেটা এখন আর নেই। এটা অনেক গভীরে চলে গেছে। আর এটা কিন্তু বিউটি ক্রিয়েট করে। তাই, এটাকে আপনার ছোট করে দেখার সুযোগ নেই।

**কিন্তু আমাদের এখানে তো অবস্থাটা এক নয়?**

আমাদের এখানে তো অবস্থা উলটোপালটা। কোনটা যে বড় আর কোনটা ছোট... কেউ জানে না। ওটা নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। যেটা সত্য— সেটা হল ফ্যাশনকে ছোট করে দেখার দরকার নেই, মানে যা কিছু বিউটি ক্রিয়েট করে সেরকম কোনো কিছুকেই আপনি ছোট করে দেখতে পারবেন না।

**না, ছোট করে দেখার প্রশ্ন নয়। ছোট-বড় বিভেদের দায় ঈশ্বরের হাতেই থাকুক...**

বিউটিই তো সব। মানুষের মনের সবচেয়ে পিওর জায়গা হচ্ছে বিউটি। মানে, ওটার সাধনা করা। সৃষ্টিকর্তার সাধনাও হচ্ছে পরমভাবে সৌন্দর্যের সাধনা (করা) এবং কেউ যদি শয়তান পূজাও করে সেটাও আরেক ধরনের বিউটির সাধনা করা। সে ডার্ক বিউটির সাধনা করছে। অর্থাৎ, বিউটিই কিন্তু শেষ কথা, এটা না থাকলে আপনার কিছু হবে না। যেমন, একটা কাঠখোট্টা প্রোডাক্টের কোম্পানি, কিন্তু ওটার মেকানিক্যাল রি-প্রোডাকশন, অর্থাৎ টোটাল প্রসেসের মধ্যে যদি বিউটির চর্চা থাকে তা হলে দেখবেন, ওটা সাসটেইন করছে বেশি দিন। কোনো কর্মে বা কাজে বিউটি না থাকাটা এক ধরনের ইগনোরেন্সের ফলন ঘটায়। আর ইগনোরেন্স মানে জানবেন পাপ/সিন। কারণ, এক্ষেত্রে আপনি বিউটিকে নেগেট করছেন। করাপশন নিয়ে সরকারি অথবা বেসরকারি লোকদের এত মাথাব্যথা কেন? কারণ, করাপশনের ফলে সংশ্লিষ্ট ইস্যুর সহজাত লাবণ্যটা নষ্ট হচ্ছে। করাপশন হচ্ছে, তাই কেউ খেতে পাচ্ছে না, সমস্যাটা কিন্তু ঠিক সেখানে নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে বিউটি এবং আগলিনেসের মধ্যে। আপনি আগলিনেসের চর্চা করছেন, মাগার

ব্যাঙ্কসি গ্রাফিতি :৪

বিউটিকে পাত্তা দিচ্ছেন না। এখন গ্রাফিতি আর্টিস্টদের কাজ বা যে কোনো আর্টিস্টের কাজ হচ্ছে সমাজকে বিউটির জায়গাটা বার বার মনে করিয়ে দেওয়া।

**আচ্ছা, এই যে গ্রাফিতি আর্টিস্টদের ক্ষেত্রে ধরেই নেওয়া হয় বা বলা হয়ে থাকে, দেওয়াল ছাড়া তাঁদের দ্বিতীয় কোনো ক্যানভাস নেই...তাই কী?**

না এটা তো আরও অনেক টাইপের হতে পারে। যেমন, বাংলাদেশের রুহুল আমিন কাজল রাস্তায় ট্রাফিক আর্ট করে। ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে করা কাজটা তো বেশ আলোচিত। এটাকে এক ধরনের ফ্লোর গ্রাফিতিই বলব আমি।

**কিন্তু... বাংলাদেশে গ্রাফিতি আর্টের চর্চা বহুল আকারে চোখে পড়ছে না কেন?**

ঢাকায় তো এখন ছোট ছোট অনেক গ্রাফিতি, স্ট্রিট আর্ট দেখি। এখানে, সালজারের নাম করা যায়... ইদানীং গ্রাফিতি বা স্ট্রিট আর্ট প্র্যাক্টিস ওর বা ওদের কাজের মধ্যে দিয়ে চায়ের কাপে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু, বাংলাদেশে হয়েছে কী...পাছে লোকে দেখে ফেলে, সেই ভয়টা বেশি! তার উপর জনগণের সংখ্যাও মাশাল্লাহ পচ্ছন্দ না হলেও সংগ্রহে রাখার মতন। তো, গ্রাফিতি আর্টিস্টরা আঁকার সুযোগই পায় না এখানে। মানে— এত চোখ...চোখের আড়াল বলে কিছু নেই। ধরুন, যদি বলা যায় চোখের রাজ্য কোনটা? তবে বলতে হয় সেটা— ঢাকা সিটি। হয়তো, কোনো একদিন দেখা যাবে আস্ত বাংলাদেশেটাই চোখের রাজ্য হয়ে গেছে। তো , এখানকার কাজের ধরন দেখলেই বোঝা যায় যে, যিনি গ্রাফিতি করেছেন, তাঁর মধ্যে টেনশন কাজ করছে অনেক বেশি। তিনি সময়ই পাচ্ছেন না, সময় পেলেই চিন্তার জায়গায় আরও মারদাঙ্গা হবে। চোখের রাজ্যে ওনাকে সময় দেওয়া হচ্ছে না। সবখানে লোক বেশি। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় দেখা যায় যে, কোনো লোকালয়ে একটা রোড পড়ে আছে...হয়তো দুমাস কেউ যায়নি কিংবা পনেরো দিনে একবার যায় বা দু-দিনে চার-পাঁচ জন লোক আপ-ডাউন করে। তো, ওই জায়গায় আপনি গ্রাফিতি করুন না। পাঁচ ঘণ্টা ঘরে কাজ করুন, কেউ যাবে না। কিন্তু, এখানে ওই সুযোগগুলো নেই, এখানে অবজার্ভার বেশি, অবজার্ভারদের কৌতূহলজনিত প্যারানইয়ার মাত্রা অস্বস্তিকর রকমের বেশি। তারা শুধু অবজার্ভ করে... কিন্তু আর কী করে আমি জানি না। মানে, এক্সপ্রেশনের ভাষা ঠোঁটে না থাকুক, রি-অ্যাকশনের রেটোরিক মুখস্ত তাদের। রাস্তায় জল বা গাসের লাইনের খোঁড়াখুঁড়িই হোক বা গাড়িতে যদি একটা ইঁদুর চাপা পড়ে সেটাও হোক— আপনি অটোম্যাটিক দেখবেন অ্যাট লিস্ট জনা পাঁচেক লোক নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে গেছে সমলোচকের নজর নিয়ে। এত অবজার্ভারের মধ্যে গ্রাফিতির মতো কাজ করা টাফ। যারা করছে, তারা অনেক সাহসী এবং ভালো কাজ করছে।

**মজার ব্যাপার হল, এত নজরের খবরদারির মধ্যে থেকে গ্রাফিতি আর্টিস্টরা শুধু প্রতিবাদী আবেগ সম্বল করে গা বাঁচিয়ে চলেন না বরং রেগুলার আর্টের যে অসারতা বা অ্যাপলিটিক্যাল হয়ে ওঠার যে পৌনঃপুনিক আস্ফালন, তাকেই উপহাস করে...**

এটা একটা মজার জায়গা এবং অবশ্যই সম্পূরক। যদি সে অন্যভাবে চিন্তা করে বা করতে পারে তা হলে ওটা তো পরে আবার মেইনস্ট্রিমে চলে যাবে। ফলে, সে তো কনট্রিবিউট করছে। মানে— সে তো আর্টের (ঐতিহাসিক) আইনগুলো ভেঙেচুরে আটখানা করছে। ফাঁক-ফোঁকরগুলো দেখাচ্ছে, আরও আরও ভাবনার সম্ভাবনার ইশারা দিয়ে যাচ্ছে, বলছে 'নেভার সে নেভার'। কিন্তু, এটা এক ধরনের প্রস্তাবনা। যে এভাবেও আর্ট হয়, খালি তোমরা যেভাবে করো সেভাবেই নয়।

**অর্থাৎ, আর্ট করতে হলে আমাকে অনেক জাননেওয়ালা, বুঝনেওয়ালা হতে হবে, অস্থির রকমের ব্যাকগ্রাউন্ড থাকতে হবে— তা নয়। তথাপি, এহেন পরিস্থিতি কি আপামর নাগরিককে এক ধরনের সমস্যায় ফেলে দিচ্ছে না? মানে, কোমল গান্ধারের গতে বাঁধা নাগরিক জীবনকে সমাজ তো আর্টের এই সংজ্ঞা শেখায়নি বা জানতে দিতে উৎসাহীও নয়।**

তা বৈকি। তবে জানবেন, গ্রাফিতির মধ্যে উইট বা বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতা থাকলে সেটা মানুষকে ঠিকই মেসেজ পৌঁছে দেয়। যেমন ব্যাঙ্কসির কাজ— এটা কী আসলে? এটা উইটের কাজ। বেসিক্যালি উইটের সঙ্গে সে মেসেজ দেয়। মানে, ঠাট্টার ছলে এক ধরনের তীব্র বিদ্রুপ ছুঁড়ে দেয় আলোকিত মানুষ-সমাজ-সিস্টেম-রাষ্ট্রের আঁধার বাস্তবতাকে উপহাস করে। এটা অস্কার ওয়াইল্ড ভালো বলেছেন— 'আপনি যদি সত্য কথা বলতে চান, তা হলে হাস্যরসের মধ্যে দিয়ে বলবেন, না হলে লোকে আপনাকে নগদ ঝেড়ে ফেলবে।'

**ঠাকুরও তো এমনই বলেছেন— 'সহজ কথা কইতে আমায় কহ যে/ সহজ কথা যায় না বলা সহজে।' যে মানুষ হরদম সহজে সত্য কথা বলে প্রাচীন গ্রিসে তাকে বলা হত ইনসেইন। আর এখন ডিকশনারি খুঁড়লেই দেখবেন যে ইনসেনের অন্যতম অর্থ কাণ্ডজ্ঞানহীন। কী বলবেন বলুন... কিছু বলার আছে?**

'ইনস্যানিটি' অনেক বড় ব্যাপার, এটা যাকে তাকে দেওয়া হয় না, ইটস্ আ ব্লেসিং। সবাই বোঝেও না জিনিসটা। 'ইনস্যানিটি'কে হ্যান্ডেল করার একটা ব্যাপার আছে। যার মধ্যে ইনস্যানিটি আছে সে যদি ওটাকে হ্যান্ডেল করতে পারে তা হলে সে বিরাট লোক। মানে তাকে ক্ষমতাই দেওয়া হয়েছে। স্পেশাল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ইনস্যানিটি হচ্ছে টাস অফ ইটার্নিটি। এ এমন এক পারলৌকিক আভাস, যার স্পর্শে আপনি সব লজিক গেটের বাইরে চলে গিয়ে আরেকটা লোক হয়ে গেলেন। আবার ওটা থেকে যদি ফিরে আসতে পারেন, তা হলে আপনি অনেক কিছু নিয়ে আসতে পারবেন ওখান থেকে। এরকম অনেক আর্টিস্ট আছেন, যাঁরা পাগল হয়ে যান, আবার ফিরে আসেন ধাতস্থ সময়ের লোকালয়ে। আমি শুনেছি ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান ভাস্কর

স্যার আনিশ কাপুরের স্কিজোফ্রেনিয়া ছিল। পরে মেডিটেট করে করে ঠিক হয়েছেন। তো, বিষয়টা এই রকমই। তার কাজ তো দেখছেনই... আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড টাইপের। মে বি, তাঁর ইনস্যানিটির ওই জায়গাটা তিনি এক্সপ্লোর করেছেন।

**মানে, স্পিরিটের টাইম মেশিনে চড়ে 'নিজ'-এর অপরিচিত এলাকা ট্রাভেলের মাধ্যমে নিজের অভেদ বা আত্ম অন্বেষণ...**

হ্যাঁ। যেমন, সালভাদোর দালির একটা বিখ্যাত উক্তি আছে না, 'পাগল আর আমার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আমি পাগল না।' কারণ ও তো ওই পাওয়ারটা বুঝতে পেরেছিল। পাগলামির পাওয়ারটা। ওই শক্তিটাকেই তো সে তার ছবির মধ্যে ঢেলে দিল। তারপর, পিকাসো ওয়াজ আ ম্যাড ম্যান টোটালি। সে একেবারে পাগলের মতো কাজ করত। প্রায় আড়াই লাখের মতো আর্টওয়ার্ক তার। ২ লাখ ৪৫ হাজার— তাঁর সমস্ত ছবির সংখ্যা। এটা তো এক ধরনের ম্যাডনেস। তো সবার মধ্যেই এগুলো ছিল। ম্যাডনেসের তো কোনো গ্রামার নেই। আর এই জন্যই সোসাইটি 'ম্যাডনেস'কে ভয় পায়। মিশেল ফুকো তো এটা নিয়েই কাজ করেছে, ওর চেয়ে তো ভালো করে এটা নিয়ে কেউ কাজ করেনি। আমি বললে এগুলোর কোনো মানে নেই। কিন্তু সে তো এটা দেখিয়ে দিয়েছে, ইন্টেলেকচুয়ালি এটা দেখিয়ে দিয়েছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, স্পিরিচুয়ালি ম্যাডনেস ইজ আ বিগ থিং।

**হ্যাঁ... সুফিবাদে আমরা দেখি তো ফানা-ফিল্লাহর কথা। আশেকের মাঝে মাশুকের লীন হয়ে যাওয়ার আর্তি-আকুতির সমর্পণ... যেমন আছে চৈতন্যচরিতামৃতে...**

এগুলো তো আল্লাহর প্রেমে পাগল হয়ে যাওয়া, উন্মাদ হয়ে যাওয়া, একটা ঘোরে চলে যাওয়া... যাকে বলে উন্মাদনায় কাটে প্রেম। এমন এক অবস্থা যে, সংসার সে করতে পারছে না। তখনই কিন্তু লোকে তাকে বলবে পাগল। আর বাউলদের মধ্যে তো এ ধরনের খ্যাপামি আছেই।

**এই পাগলামি-উন্মাদনা-খ্যাপামি কিন্তু আত্ম-ভড়ংয়ের জন্যে নয়, বরং জনপরিসরে স্টুপিডিটি, ভাল্‌গারিটি ক্রুডনেসের বিপ্রতীপে সুরুচি, জ্ঞান, তনিমা এসব চর্চার নিমিত্তেই ঘটেছে। নতুন ধরনের একটা সফিস্টিকেশন সেটা।**

যে সফিস্টিকেশনের কথা আপনি বলছেন, আমাদের সোসাইটির মধ্যে এটা অ্যালাও করা হয় না। মানে এটাকে খারাপভাবে দেখা হয়। মানে সফিস্টিকেশনের আবার আরেকটা ইতিহাস আছে, আলাদা ব্যাপার... কেন এই জায়গায় এসে দাঁড়াল তারও একটা ইতিহাস আছে। এটার মধ্যে ক্লাস স্ট্রাগল আছে। যখন আপনি নিচু ক্লাস থেকে উপরে উঠবেন, তখন আপনাকে কিছু অস্ত্র নিয়ে যেতে হবে... আর প্রথম অস্ত্রটাই হচ্ছে সফিস্টিকেশন। আমাদের সমাজে দেখবেন, কেউ যদি হঠাৎ করে উপরের ক্লাসে উঠে যায় তা হলে কিছু সফিস্টিকেশনের চর্চা শুরু করে। যেগুলো তার নিজের নয়, অ্যাডাপ্টেড। কিন্তু, সমাজচ্যুত হবার ভয়ে সে ওই আদব-কায়দাগুলো মেন্টেইন করে। এবং আগের সমাজকে নেগেট করা বা ঘৃণা করার জায়গা থেকে ওইগুলো করে। তো, ওই জায়গায় যখন সে গেল, তখন সে একটা 'সেট' লোক। সে তখন ম্যাডনেসকে কখনওই নিতে পারবে না। ইভেন যারা সফিস্টিকেটেড হয়ে উঠবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তারাও সহ্য করতে পারবে না। কেননা, 'ম্যাডনেস' তো সোসাইটির ল অ্যান্ড অর্ডারকে ব্রেক করছে।

**'ম্যাডনেস' তো তথাকথিত যাপনকে ডিনাই করে...**

এবং তথাকথিত সব কিছুকে ব্রেক করে। মানে, এটার কোনো গ্রামার নেই। এবং 'ম্যাডনেস'-এর মধ্যে এমন ইগো আসবে যার কোনো রিয়ালিটি নেই। আবার, এমন নন-ইগো আসবে যেটারও কোনো রিয়ালিটি নেই। যেমন, একটা পাগল রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে বলল যে, আমি হিটলারের ছেলে! কে আসবি আমার সঙ্গে লড়াই করতে! সে কিন্তু এটা বিশ্বাস করছে যে, সে হিটলারের ছেলে। ওটাই তার রিয়ালিটি। কিন্তু সোসাইটি তো এটা মানবে না। সোসাইটি আবার জানে 'হিটলার' কে। ফলে যখন সিদ্ধান্ত নেবে যে, এই ব্যাটা তো হিটলারের ছেলে নয়, এ পাগল কিংবা মিথ্যাবাদী। ওকে মেলাবে দুটি ইমেজের সঙ্গে। আবার সরাসরি মিথ্যাবাদীও ভাববে না। কারণ, এত সরল মিথ্যা কেউ বলে না। ফলে পাগল বলেই সাব্যস্ত করবে।

**আর আমাদের পাওয়ার পলিসিটাই এমন যে, কাউকে সাইড লাইনে বসিয়ে দিতে চাও তো দাও তাকে পাগলের ট্যাগ! ব্যস! দুই মিনিটে হয়ে গেল ঝটপট মজাদার ফ্যাসিজম...**

ধরুন, আমাদের ফ্যামিলিতে যদি কেউ পাগল থাকে, সবাই চায় ও পাগলই থাকুক। যাতে সম্পত্তি না দিতে হয়। আর ফ্যামিলির স্ট্রাকচারই তো রাষ্ট্রের স্ট্রাকচার।

**বাই দ্য ওয়ে, গ্রাফিতি আর্টিস্টরা যেহেতু এক অর্থে স্পেস ইনভেডর, সেহেতু তারা রাষ্ট্রের খাতায় নৈরাজ্যবাদী। আর কেতাদুরস্ত শিল্পীরা স্টেট ডিফাইন্ড জোনে শৈল্পিক পায়চারি করে বলে তারা নিরাপদ। এটাকে আপনি কীভাবে দেখেন?**

এটা মূলত 'স্পেস'-এর ব্যাপার। আপনি ধরুন, রাস্তার একটা ওয়ালে একটা ছাগল আঁকলেন— ছাগলটা কেক বা এরকম কিছু খাচ্ছে বা বার্গার খাচ্ছে। কিংবা ধরুন স্মোক করছে, এটা তখন অ্যানার্কিজম হতে পারে। আবার একটা ছাগল কেক খাচ্ছে বা বার্গার খাচ্ছে বা স্মোক করছে, এটা একটা ক্যানভাসে এঁকে যদি বড় গ্যালারির মধ্যে রেখে দেন তা হলে আপনি 'ইন্টারেস্টিং আর্টিস্ট'! এটাই পার্থক্য আর কী।

**দেখা যাবে যে, এই ইন্টারেস্টিং আর্টিস্টকে নিয়ে কিউরেটর মহাশয়ও অনেক কিছু লিখে ফেলেছেন...**

এটা হচ্ছে স্থান, কাল ও পাত্রের যে সংজ্ঞা, তার মধ্যে পড়ে, কোনটা কোন জায়গায় রাখবেন। মানে স্পেস। স্পেসটা হচ্ছে সবচেয়ে আল্টিমেট জায়গা। কারণ, স্পেস মানেই তো আপনার অবস্থান— হোক সেটা ভৌগলিক বা রাজনৈতিক দু'টোই। জমি দখল, রাষ্ট্র দখল, সবই চলছে স্পেস বা জমিনের গতরের উপর দিয়ে। তো, স্পেসের মধ্যে ভাগ করা আছে, কর্তা একেকটা জোন তৈরি করে দেখিয়ে দিয়েছে ওই স্পেসে তার পাওয়ারের দৌড় কতখানি! যেমন, আমার মন্দিরে পাওয়ার একরকম, মসজিদে পাওয়ার অন্যরকম। এই রকমভাবে সব জায়গায় পাওয়ারের প্যারামিটার নির্দিষ্ট করে

ব্যাঙ্কসি গ্রাফিতি :৫

দিয়েছে। তো, রাস্তায়-যে পাওয়ারটা আছে বা দেওয়ালে যে পাওয়ারের নোক্তাগুলো আছে ওখানে যখন আপনি আঁকাআঁকি শুরু করেন, তখন সমস্যা হয় আর কী... কেননা, পথ চলতি চকিতে দেখা এইসব আর্ট-কলা বোধিতে দেয় ৪৪০ ভোল্টের ঝটকা! কিন্তু, গ্যালারিতে যে পাওয়ারটা দেওয়া আছে ওখানে ওই ঝাঁকিটাকে লেজিটিমাইজ করা হয়েছে, যে কারণে আমি বললাম, যখন আপনি সার্টেইন এরিয়া দিয়ে বলে দিচ্ছেন— এই জায়গায় তোমরা গ্রাফিতি করো, তখন বেসিক্যালি ওই উন্মুক্ত বলয়টি ভার্চুয়ালি গ্যালারির বাস্তবতা অর্জন করছে। মানে আকাশটা খোলা কিন্তু অদৃশ্য ছাঁদে ঢাকা। রাষ্ট্র যেন বলছে— এই যে তোমাকে গ্যালারি দেওয়া হল, এখানে তুমি পাগলামি করো, ছাগলামি করো, যা করার করো। তুমি রঙ দিয়ে নাকি কাদা দিয়ে নাকি পায়ের ধুলো দিয়ে ছবি আঁকবে— এটা তোমার ব্যাপার, আই ডোন্ট মাইন্ড। কারণ, পাওয়ার স্ট্রাকচারে ওটা কোনো প্রভাব ফেলছে না। তো, প্রেসক্রাইবড স্থান-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করাই হচ্ছে টেরিটোরিয়াল ক্রসিং। আর এটাই আপনার কাজ। যদি টেরিটরির সীমানা তছনছ করে কমফোর্ট জোনে ঢুকতে পারেন তা হলে ওটা 'রেবেল স্টেপ' হয়ে যাবে। আর টেরিটোরির মধ্যে করলে আর যাই হোক কোনো স্পর্ধিত আচরণের স্ট্যাটাস পাবে না... হোয়াটএভার ইউ ডু!

তবে, এর উপরেও একটা কথা আছে । ধরুন এটাই কিন্তু আল্টিমেট কথা নয়। গ্যালারিতে বসে যদি আপনি সরকারবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী একটা ছবি আঁকতে পারেন, একটা বৈপ্লবিক ছবি আঁকতে পারেন, যেটা অনেক কিছুকে চেঞ্জ করে দেওয়ার পাওয়ার রাখে... তবে ওটা কিন্তু খারাপ নয়। এই কথা থেকে অনেকে ভাববে যে, ওটা আবার খারাপ নাকি... ওটা খারাপ নয়। ওটার লং টার্ম এফেক্ট আছে। একেকটা আর্টের শক্তি কিন্তু অন্য রকম। যাই বলি না কেন আমরা— আর্ট আবার সব টেরিটোরির বাইরের জিনিস। যে টেরিটোরিতেই আপনি রাখেন না কেন, আপনি যদি আপনার আর্ট ওয়ার্কে এনার্জি ডিসচার্জড করতে পারেন— তা হলে তা সব টেরিটোরিই বেরিক করতে পারে। এখন গ্রাফিতির যে সামাজিক জায়গাটা, সেক্ষেত্রে আমি বলব যে, সেটা টেরিটোরিয়াল ফাইটের জায়গা।

> ***The time of getting fame for your name on its own is over. Artwork that is only about wating to be famous will never make you famous. Any fame is a by-product of making something that means something. You don't go to a restaurant and order a meal because you want to have a shit." – Banksy***

**এখানে, মানে এই ঢাকা নামক গ্রামে এখনও আমরা যেসব মোটিভ নিয়ে, যেসব রেফারেন্স নিয়ে শিল্পচর্চা করার যে কোশিশ জারি রেখেছি, সেখানে আর্টের দ্বারা অ্যানার্কি তৈরি করা বা এনার্জি ট্রান্সমিট করার এই প্রবণতাকে আপনি কীভাবে দেখেন?**

ঢাকা নামক গ্রামে সমস্যা নেই আমার। কিন্তু ধান চাষ হচ্ছে না তো! গ্রামে ধান চাষ হবার কথা। সরিষা ক্ষেত্র নেই। কিছু নেই। খালি আছে রোড-জ্যাম

-গাড়ি-ককটেল-পেট্রোল-বোমা-ট্রাক এই সব। এখানে থাকা উচিত সুন্দর সরিষা ক্ষেত্র, তা হলে এলাকার লোক সব ভালো হয়ে যাবে। যেখানে যেটা দরকার। কিন্তু, এ গ্রামের মধ্যে লাগিয়েছেন বড় বড় বিল্ডিং আর হাঁকিয়েছেন গাড়ি তো ওখান থেকে হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট? আর্ট অ্যাটাক ঘটাতে হলে আপনাকে পাবলিকের সঙ্গে নৈকট্য বৃদ্ধি করতে হবে। পাবলিককে পাত্তা না দিয়ে এটা ঘটার নয়। যেমন— শাহবাগে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকারদের ফাঁসির দাবিতে এই যে গণ-জমায়েত হল, তখন তো প্রচুর আর্ট প্রোডিউস হয়েছে। খুবই ইন্টেরেস্টিং কিছু আর্ট হয়েছে। যেমন, একজন আঁকল রাজাকারদের জন্য কুকুরের ভাজা মাংস পাওয়া যায়, দাম এক টাকা। আরেক জায়গায় কুকুরের বিষ্ঠার ছবি এঁকে সেখানে একটা মোমবাতি দিয়ে দিয়েছে আর লিখে দিয়েছে রাজাকারের বার্থডে কেক...। আবার, ছোট ছোট পুতুলের মতো লোকজ স্টাইলে রাজাকার বানানো হয়েছে। তো, ওখানে প্রচুর পরিমাণে আর্ট হয়েছে— এগুলো কিন্তু 'র পাবলিক আর্ট'। এখানে কিন্তু আর্টিস্টদের সম্পর্ক নেই। এগুলো কিন্তু ঘটেছে এবং এগুলো ইতিহাসের মধ্যে থাকবে, যদি কেউ এগুলো নোট করে থাকে...আমি জানি না, কেউ আর্কাইভ করে রেখেছে কি না! এখন গণ-জমায়েত সফল হোক বা বিফল হোক অথবা অর্কেস্ট্রেটেড হোক..। যাই হোক আমি এত কিছু জানি না। জানার দরকারও নেই। আর্টগুলি কিন্তু জনমানসে ছাপ ফেলেছে। চিন্তার-চেতনার-কল্পনার বিস্তার ঘটেছে। একটা ইস্যুতে সকলে জড়ো হলেও বিষয়টার সিগনিফিকেন্সি আর ওই ইস্যুতে আটকে থাকেনি। ওখানে ইমাজিনেশন অ্যাড হয়েছে বিভিন্ন রকমের। এটাই বেশি ইন্টারেস্টিং আমার কাছে। 'রাজাকারের ফাঁসি চাই' শব্দের সঙ্গে ব্যাপক ইমাজিনেশনের চক্র তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন জায়গা থেকে, যেমন গুলশান, বনানী, বারিধারা, ধানমান্ডি, শেখেরটেক, গোপীবাগ, সব জায়গা থেকে লোকজন সেই সময় এক জায়গায় হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির লোক এক হয়েছে। এক হয়ে একটা পলিটিক্যাল-কালচারাল উদ্‌যাপনের অংশ হয়েছে। শব্দটা ফাঁসি চাই বলছে, কিন্তু ওই জায়গায় আর আটকে থাকেনি...নতুন সংস্কৃতি বা আর্টে চলে গেছে শঅবচেতনার জায়গাটা। আর্ট, মিউজিক, অ্যাক্টিং এগুলোর মধ্যে চলে গেছে।

ব্যাঙ্কসি গ্রাফিতি :৬

একটা কালচারাল অ্যাক্ট হয়েছে। এই ধরনের ইস্যুগুলো থেকেই নতুন আর্ট আসে। এখন গ্রাফিতি যে করে সে তো এমনি এমনি করে না, তার মধ্যে কিছু প্রশ্নের বিবমিষা তৈরি হয়েছে বলেই সে গ্রাফিতিতে রত হয়। আবার অনেকে আছে, দেওয়াল পেয়েছে আকঁছে, তখন হয়তো তার মধ্যে আঁকিবুঁকি করার চুলকানিই প্রবল ছিল, পরে সে নিজেই উপলব্ধি করল, আচ্ছা এভাবেও তো আর্ট করা যায়, তা হলে এভাবে করি। তারপরে আস্তে

ব্যাঙ্কসি গ্রাফিতি :৭

আস্তে বড় জায়গায় যায় যখন, সে অন্যান্য প্রশ্নগুলো ফেস করতে শেখে— আচ্ছা এটার মধ্যে দিয়ে আমি সমাজের কথা বলি, দর্শনের কথা বলি...এই ধরনের বিষয়গুলো। যেমন, বিরাট একটা সাদা দেওয়াল, ওখানে জাস্ট লিখে দিল 'দিস ইজ নট আ গ্রাফিতি আর্ট! দেওয়ালটা কিন্তু শেষ হয়ে গেল।

**তা হলে, প্রশ্ন-উত্তরের থেরাপির ভিতর দিয়ে এই চরাচর-আর্ট-যাপনের বা জীবনের উৎসব অথবা চার্মের যে অনটন বা ডেফিসিয়েন্সি আছে তার ঘাটতি পূরণ সম্ভব?**

হ্যাঁ আমাদের অনেক ডেফিসিয়েন্সি আছে, আছে আমাদের পুরো সোসাইটিতে, আমাদের রাষ্ট্রে। আবার প্রশ্ন— এই ডেফিসেয়েন্সিগুলোই কিন্তু আবার এক ধরনের এফিসিয়েন্সি হতে পারে...যদি রূপান্তর ঘটানো যায়। দেখবেন যে, আমাদের দেশে অনেক বন্যা-টন্যা হয়েছে, এখন আমাদের দেশের লোকজন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সামালোর জন্য বেস্ট। এখানে যত লোকজন আছে এখন আমরা যদি শ্রম রপ্তানি করতে পারি পুরো পৃথিবী ছেয়ে ফেলা যাবে। আমাদের ডেফিসিয়েন্সিগুলোকেই পজিটিভলি অর্কেস্ট্রেটেড করতে পারলে দেশকে অনেক এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে। মানে ডেফিসিয়েন্সিকে কাজে লাগানো। যেমন— আরব দেশে কোনো গাছ নেই, কিন্তু পেট্রোডলার সব ডেফিসিয়েন্সি ঠিক করে দিচ্ছে। এবং সামনে আরও করবে। আবুধাবিতে আবার আড়াই মাইল এরিয়া জুড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সোলার প্যানেল বসানো হচ্ছে। ওরা যদি এভাবে সোলার প্যানেল বসাতে থাকে তা হলে ওদের তেল যখন শেষ হয়ে যাবে, সূর্য বিক্রি করেই তো আরও বারো কোটি আলোকবর্ষ চলতে পারবে বা সূর্য নেভা পর্যন্ত চলতে পারবে। এখানেও ডেফিসিয়েন্সিগুলোকে এফিসিয়েন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন এটা ডিপেন্ড করে রাষ্ট্রের মানুষের বুদ্ধিমত্তার উপর। যেমন— পশ্চিমের মানুষরা তাদের ডেফিসিয়েন্সিকে এফিসিয়েন্সিতে রূপান্তর করেছে বিভিন্ন দেশে ইনভেড করে, ওখান থেকে সম্পদ লোপাট করে ওরা নিজেদের সাজিয়েছে। যদি ওখানেই তাদের সম্পদ থাকত তা হলে এদিকে তারা আসত না। তাদের ডেফিসিয়েন্সিগুলোই তাদের এফিসিয়েন্ট করে তুলেছে। এভাবেই হয় ব্যাপারগুলো।

**আর আমরা কী করছি?**

হ্যাঁ, করার চেষ্টা করছি, কিন্তু আটকে যাচ্ছি কিছু মানুষের জন্য। ওই যে বললাম ৫০ বা ১০০ জন লোকের জন্য আটকে যাচ্ছি...আর কিছু না। কিন্তু আমরা পাওয়ারফুল নেশন হতে পারি। কোনো ব্যাপার নয়, আমাদের পোটেন্শিয়ালিটি আছে।

**এনার্জিও আছে...**

হালেলুইয়াহ ! হা হা হা ■

## ৬. রাত্রি চতুর্দশী   পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল
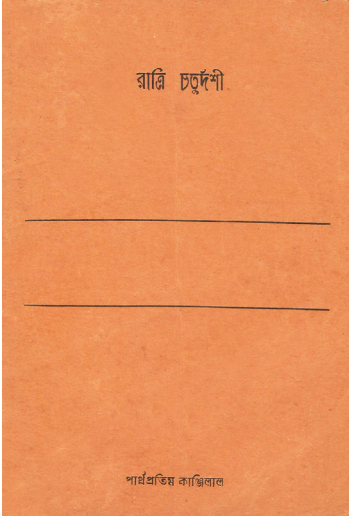
নিশির গ্রহণে-দেখা পূর্ণনষ্টা সবুজ ডাবের
অজগর পুরোহিত ব্লেড ঘষে বুকে। দুরাসদ

মাংসের মীমাংসা, সারিবন্দী শনি, পাশে প্রস্রাবের
জলজপ, সর্পপ্রজ্ঞা, গোমেদরঙের কাঁচমদ
চন্দ্রকান্ত চরসের ধূম, ঘুম ভৈরবীনাভির

আজ্ঞা, আজ্ঞা। ঈশ্বর, তোমাকে জানি মলমূত্রবৎ।
বিপরীতপ্রসূতিসদনে, বাচ্চার চিতার কাছে
রূপোর খাঁড়ারা ওঠে, গর্ভগর্ত, নড়ে জিহ্মজিভ,
ঊরুব্যাদানের পল্লী, কঁহি ধুঁয়া য়ঁহা নাচেনাচে

আউয়া আউয়া। জুয়া খেলে যোনিগুহাসর্পশিব,
প্রচেত হাউই বলে: আমার বাপের সঙ্গে শো, মা।
সঙ্গমনর্তিত নিতম্বের চন্দ্রহারের সুষমা
ব্রহ্মবাহিনীর জলে, চক্রে প্রণবচতুর। দোষী
হিম, শব নেই। অগ্নি, কবি আছে। রাত্রি চতুর্দশী। ■

৮ ও ৯. ৩. ৮৩
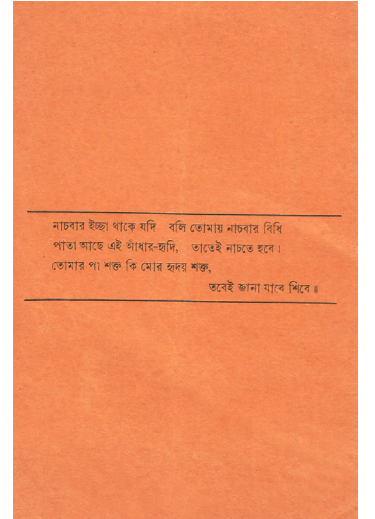
নাচবার ইচ্ছা থাকে যদি   বলি তোমায় নাচবার বিধি
পাতা আছে এই আঁধার-হৃদি,   তাতেই নাচতে হবে।
তোমার পা শক্ত কি মোর হৃদয় শক্ত,
তবেই জানা যাবে শিবে ॥

রাত্রি চতুর্দশী/ সনেট সংগ্রহ/ ১৯৮৩

# ৭. মিথ্যার জবাবে পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ‘দেশ’ পত্রিকার ২৭ তারিখের সংখ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় (ওঁদের সঙ্গে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন কেন কে জানে!) বাংলা কবিতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জানান যে, বাংলা ভাষায় এত কবি কেন? এটা তাঁরা বুঝতে পারছেন না এবং এই সব কবিদের অধিকাংশের কোনও ছন্দজ্ঞান নেই। সুনীল-শক্তির বাংলা কবিতা নিয়ে এই মাতব্বরির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয় ‘পুনর্বসু’র (বসন্ত, ১৩৯৪)
সংখ্যায়, সেটি ছিল দ্বিতীয় সংখ্যা। আমরা বুঝেছিলাম যে, বাংলাভাষায় কবিদের উত্তরআধুনিক বিস্ফারকে সুনীল-শক্তির পক্ষে তাঁদের কৃত্তিবাসীয় আধুনিকতা দিয়ে বোঝা সম্ভব নয়। প্রসূন বন্দোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় ছাড়া চিঠি ও প্রবন্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন কালীকৃষ্ণ গুহ, রণজিৎ দাশ, তুষার চৌধুরি ও পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল। পার্থপ্রতিম তাঁর প্রবন্ধে (মিথ্যার জবাবে) শক্তির কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে দেখান যে, ছন্দজ্ঞান শক্তিরও নেই। পার্থর লেখাটি ছিল সবচেয়ে অ্যাগ্রেসিভ।

**সুরজিৎ সেন**

## মিথ্যার জবাবে ● পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

‘কবি না হলেও, একজন কারিগর তো হয়েছি।’ শক্তি চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ২৭/২/৮৮’র দেশ পত্রিকায়, শীর্ষেন্দু ও সুনীল-সহ কথোপকথনছলে। কারিগর বলতে যদি যে সাপ্তাহিকের প্রতিষ্ঠানে তাঁর আপিশ, তার কারিগর বোঝায়, তাহলে আলাদা কথা। কিন্তু যদি কবিতার কারিগর বলতে চান তিনি নিজেকে, তাহলে, আমি মাত্র তিনটি উদ্ধৃতি দেবো:

১। বাবার হাতে তৈরি আমি, এক মুহূর্তে ভাঙবো পিঠের
উল্টে-রাখা সাধের সিন্দুক—মোহর মেজেয় পড়বে ঝরে

নীল জলে লাল পাথরকুচি আষ্টেপৃষ্টে আলিবাবার—
আমিএকটি সোনার মাছি খুন করেছি রাতদুপুরে
স্বাদু ফলের চতুর্দিকে জালের তৈরি শক্ত বেড়ায়
বাদুড় তুমি একলা পড়ো—আমি সিন্দুকে সাঁতার কাটছি।

পাখি আমার একলা পাখি/পৃষ্ঠা ১৫।

২।　তাই নিয়ে কি হয় না মিছে
দিনদুপুরে এই যে হাঁটা—সব তো সমতল-পিরিচে
রেখেই আসছো, সঙ্গে নিলে
সামান্য কি যথাসর্বস্ব?

আর কিছু নয়, স্বাস্থ্যরক্ষা/পৃষ্ঠা. ২৩।

৩।　হেঁটোয় কাঁটা—ওপারে কাঁটা, এই কি দীর্ঘ জীবনযাপন?
এই কি রোমাঞ্চকর যামিনী, হায় মাছি তুই সোনার বরণ।
খুন করেছি হঠাৎ আমি বাঁচবো ব'লে একা-একাই
দূর সমুদ্রে পাড়ি দেবোই,
. . . . . .
দীর্ঘতম জীবন এবার তোমার সঙ্গে ভোগ করেছি

এই তো রোমাঞ্চকর যামিনী—সোনায় কোনো গ্লানি লাগে না/পৃষ্ঠা ২৪।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

একা-একাই . . . পাড়ি দেবোই অবশ্য কোনো ছন্দভুল নয়, তেরো বছরের বালক পর্যন্ত এই ই-ই লিখনরীতি মার্জনীয়। ঐ বয়স পেরোলে নয়। যে বইতে এসব রয়েছে তা হলো শক্তির 'সোনার মাছি খুন করেছি'। ৬৭-র জুনে, তাঁর তেত্রিশ-চৌত্রিশ বছর বয়সে, প্রকাশিত। এই গ্রন্থের খ্যাতির কথা কারোরই অজানা নয়। গত ২১ বছরে, স্বকথিত এই কারিগর স্বরবৃত্ত ছন্দ লিখতে গিয়ে কৃত এই অপকর্মগুলির একটিও সংশোধন করে উঠতে পারেননি। তাঁর সমস্ত দ্রুতছন্দের লেখায় এহেন বিপর্যয় ঘটেছে—একথা বলছি না। এমন কি, ঐ স্বরবৃত্ত লেখার সময়, সূর্যদেব চ/লে পশ্চিমে—জাতীয় মধ্যখণ্ডন তাঁর লেখায় বহু পরিমাণে পাওয়া গেলেও, আমরা সস্নেহেই দেখে থাকি।
একদল চতুর বলবেন, শক্তি ছন্দ ভেঙেছেন। স্পষ্ট বলা দরকার যে ছন্দ-ভাঙার কথা আলাদা, সেখানে ছন্দের এমন কাপড়ে-চোপড়ে হয় না। দৃষ্টান্ত ঃ

সুতপা　সারা দেশগাঁ/ জুড়ে মধুবরিষণ
সেনগুপ্ত　ভিজেছি নীলাম্বরী
　ভালোবাসি, তাই/ শান্ত থাকতে পারি

তিন+তিন-এর যে মাত্রাবৃত্ত, তার সাধারণ অঙ্ক-গণনার সারা দেশগাঁ একমাত্রা কম। মজা এই যে এই অঙ্কের বোধ পাঠকের কখনই আসবে না; একেই বলে ছন্দ-ভাঙা, ছন্দের ব্যাকরণকে পুরো নিজের হাতে নেওয়া। না হলে ছন্দ ঐভাবেই ধেনে-কেটে ধিড়িংগেটড়ে ওঠে—স্বয়ংকথিত কারিগরের হাতে যা হয়েছে। নমুনাটি বিশেষ করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্য দেওয়া হলো; কেননা, সুনীল, ১৯৮৪ সালে দেশ পত্রিকায় একটি তিন+তিনের মাত্রাবৃত্ত লিখতে গিয়ে একটি পংক্তি লেখেন ঃ 'আমার হলো না যাওয়া, যাওয়া হলো না, হলো না যাওয়া।' দুই যাওয়া ও দুই হলো নার মধ্যে, না, কোনো inner space নেই। দেশগাঁর শেষ আকারকে একমাত্রা প্রস্বর হিসেবে টানা যায়—গ ব্যঞ্জনবর্ণ বলে; 'যাওয়া' শব্দটা কঠিনভাবে দুমাত্রা ওজন, যাওয়াকে আর টানা যায় না, সুনীল! ছন্দ তো আর কবিতার মতো সাবজেকটিভ, অর্থাৎ, বড়াসাবমুখাপেক্ষী নয়। এবং, এই সুতপা সেনগুপ্ত ১৯৭৯-এই লেখেন 'রোহিত' নামে একটি কবিতা, তখন তাঁর বয়স ১৬/১৭—সেই কবিতাটি প্রফেশনপ্রিয় সুনীলের প্রফেশনের স্বার্থেই, পড়ে দেখা উচিত। কুমীরকুমারীর দ্রুত বিন্যাস যাঁরা ঘটান তাঁদের পিঠ চাপড়ে কোনো লাভ নেই।
শক্তি চট্টোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন ধরেই নানা উষ্মাজড়িত শ্লেষ বা শ্লেষ্মার উদ্‌গার করছেন নবীনবয়সী কবি ও কবয়িত্রীদের দিকে। এছাড়া তাঁর উপায় নেই, আমরা বুঝি। পানাসক্তি চাইবাসা জনৈক চিত্রতারা প্রভৃতি নানা উপায়ে দীর্ঘদিন তিনি 'স্টোরি' হয়ে এসেছেন এবং সেই সুবাদে ৬৭ সাল থেকেই প্রধানতম কবি হিসেবে চালিয়ে যাচ্ছেন। এখন বয়স হয়েছে; এই পথগুলি আর প্রশস্ত নয় দেখে এই পথ নিয়েছেন। তাঁর নিজের নাম শুনেই যে চট করে বোঝা যায় না তিনি মহিলা না পুরুষ—এই ধারণাই তাঁর হয়নি। ইদানীং গদ্য পদ্যে তিনি বলে যাচ্ছেন কবিতা লিখে শুধু তাঁরই কিছু হয়েছে, বাকিদের কিস্যু হয়নি। এমন দখনে-ইতরতা, বাংলা সাহিত্যে আগে আমরা দেখিনি। অমুক ছন্দ জানে না, তমুক ছন্দ ভুল করে। হে প্রাক্তন কবি, এসব বলতে গেলে, সাবুদ দেখিয়ে বলতে হয়। এতো কবি কেন? শক্তির প্রশ্ন। আমার উত্তর, তিনিও কবি পরিচয় পাচ্ছেন বলেই বাকিদের সাহস হয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যাই হোক, এই কথোপকথনে অন্য কোনো বিষয়েই এঁরা আলাপ চালাতে পারলেন না, অনবরত ছন্দের কথা হতে থাকল। সুনীল চালাকের মতো বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে শক্তি ছন্দের ব্যাপারে খুব রিজিড। বস্তু যে কি, প্রথমেই দেখিয়েছি।

কোন্ ছন্দ? পয়ার, অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত—এগুলোকে বাঁধা-ছন্দের মধ্যেই ধরা হয়। গদ্যও এক ছন্দ—যে ছন্দে শক্তির ব্যর্থতা সকলেই দেখেছেন। ছয় ও সাতের দশকে, বাঁধা-ছন্দে, লেখা হয়নি? সব গদ্যে লেখা হয়েছিল? এঁদের এই তথ্যবিকৃতিতে প্রথম উৎসাহ জুটিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষ, 'সত্য' শব্দটি ছাপতে যিনি বড় বেশি ভালোবাসেন—১৯৬৬-র শেষে কৃত্তিবাসে ছন্দোহীন সাম্প্রতিক লিখে। ঐ ১৯৬৬-র গ্রীষ্মে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বাংলা কবিতা'য়, যার সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং শক্তি চট্টোপাধ্যায়, ১৮/১৯ বয়স্ক অমিতাভ গুপ্ত লিখেছিলেন 'মন্দিরে' নাম্নী কবিতা সমিল তিন+দুই+দুই-এর মাত্রাবৃত্তে, একই সময়ে প্রকাশিত কৃত্তিবাসে গৌতম মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'উদাসী সন্ন্যাসী', পাঁচ মাত্রার মাত্রাবৃত্তে। তখন তাঁর বয়স ১৭। এগুলি দেখেননি শক্তি-সুনীল-শঙ্খ? অন্য পত্রিকা না-ও দেখতে পারেন ধ'রে নিচ্ছি। সামসুল হক, গীতা চট্টোপাধ্যায়, শংকর দে, বিজয়া মুখোপাধ্যায়, করুণাসিন্ধু দে, তুষার রায়, সুব্রত চক্রবর্তী, চিন্ময় গুহঠাকুরতা এঁরা ১৯৬৫-র আগে থেকে লিখেছেন, প্রত্যেকেই বাঁধা ছন্দে মূখ ভ্রম ব্যতীত ঠিকঠাক লিখেছেন। দেবারতি মিত্র ৭১ সালে গল্পকবিতায় স্বরবৃত্তে অতি চমৎকার লেখা লিখেছিলেন। ভাস্করকে হয়তো ৭ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনো তালপ্রধান ছন্দে লিখতে দেখা যায়নি, কিন্তু এই সময় পর্যন্ত তাঁর অক্ষয়বৃত্ত ছন্দের সুষমা কে ভুলবে? সত্তরের কিছু আগে অরুণ বসু, রণজিৎ পাল ও নিশীথ ভড়, সত্তরের প্রথমে তুষার, শ্যামলকান্তি, বীতশোক, মৃদুল সত্তরের মাঝামাঝি গৌতম চৌধুরী, কাঞ্চনকুন্তলা, সন্দীপ মুখোপাধ্যায়, অনির্বাণ লাহিড়ী—অনেকেই ছন্দে লিখেছেন, হতে পারে যে অন্য কেউ কেউ স্বরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত বা সংস্কৃতানুগ ছন্দ, যেগুলিকে আমি 'তালপ্রধান' বলছি, তেমন পছন্দ করেননি। সুতরাং, আটের দশকের নবীনরা ছন্দ নিয়ে বেশি যত্ন করছেন, এই তথ্যবিকৃতি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কোন স্পর্ধায় করছেন? একটু বাদে তিনি তাল সামলাবার জন্য বলছেন, অনেককে জানি ছন্দ খুব ভালো জানে, কিন্তু কবিতা হয় না। 'কবিতা হয় না'—কথাটার হেডপণ্ডিতির কথা বাদ দিচ্ছি, ধরে নিচ্ছি, তাঁর ভাল লাগে না। তাতে কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু ছন্দোযত্নের ইতিহাস জয়, মল্লিকা, সুবোধের একমাত্র প্রাপ্য নয়। প্রথমত, জয় ও সুবোধ সাত দশকের মাঝামাঝি থেকেই লিখছেন : সুবোধের এই তালপ্রধান ছন্দ নিয়ে যত্ন বছর তিন-মাত্র হলো। শঙ্খর সঙ্গে 'ছন্দোহীন সাম্প্রতিক' নিয়ে আমার কথা হয়েছিল, তিনি মৃদুকণ্ঠে দুঃখ প্রকাশও করেছিলেন, পরে 'প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় 'ছন্দোপকথন' (৮৪ সালে) পড়ে বুঝি যে যে কোনো মূল্যে তিনি কয়েকটি নামকে তমসাবৃত রাখতে চান। না হলে, যে নামগুলি অন্তত ব্যতিক্রম হিসেবেও ছন্দোহীন সাম্প্রতিকে তাঁর রাখা উচিত ছিলো, সেগুলি এই দ্বিতীয় সুযোগেও বলা হয়নি কেন?

পাঠকের জন্য এবার আরো একটি লেখা ঃ

স্বর্ণময়ী পুকুরের কথা

গ্রীষ্মশেষের/ প্রথম যেদিন/ চাঁদ দেখা যেতো  
গ্রহান্তরের/ নভঃচরদল/ নামতো যখন  
স্নান সেরে ঘাটে/ অন্তর্বাস/ ফেলে রেখে যেতো

এখানে বুড়োরা/ খোঁজে মাটি খুঁড়ে/ —হাতে লণ্ঠন  
নামে কামপরী,/ শিশ্ন শিথিল,/ উর্দ্ধরেতঃ  
ওই কৌপীন/ প'রে ডুব দিলে/ —পুনর্যৌবন।

লেখিকা মল্লিকা সেনগুপ্ত। 'কবিতাপত্র সংবর্ত' ৮৫-র মে-আগস্ট সংখ্যায় ছাপা। কোনো ছাপার ভুল নেই এটা এই কারণেই বলতে পারি যে, বন্ধুজনের পত্রিকা হিসাবে আমিই প্রুফ দেখেছিলাম, এবং মল্লিকা কোনো সংশোধনী পাঠান কিনা—এর জন্যে বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করা হয়েছিলো। এই নয় যে, এই প্রকার গোদা ভুল তাঁর লেখায় আরো দেখেছি অনেক। ইদানীং তিনি ছয় ও সাতমাত্রার লেখা রচনায় মন দিয়েছেন—যার দ্রুত প্যারোডিযোগ্যতা অভিমান ২৫-এ দেখিয়েছেন প্রসূন বন্দোপাধ্যায়। প্রসূন অবশ্য 'পুচ্ছ মম/ উচ্চে তুলে/ গুচ্ছ লিখে/ চলি—মুহ্যমানে/ উহ্য রহো,/ গুহ্য নাহি বলি'—ধরণের ছন্দ, যে ছন্দে যথেষ্ট লিখেছেন জয় গোস্বামী, নিয়ে কোনো কথা বলেননি। যাই হোক, মল্লিকাকে ছন্দের ব্যাপারে অতি সতর্ক যত্নবান বলা যায় না। তবে কি এই কারণেই তাঁদের কীর্তন? ঠিক কোন কারণে, ক্ষৌরকারসুলভ ছন্দোনৈপুণ্য, না ভুল ও কুৎসিত ছন্দে অন্তত একটিও লেখা

শঙ্খ ঘোষ

ছাপানোর কারণে?

শঙ্খ, শক্তি, সুনীল, জয় ও মল্লিকা— যে পাঁচজনকে এখানে বাধ্যত আক্রমণ করা হলো, এঁদের লেখা-শৈলী এবং কিছু লেখা, যে প্রথম তিনজনের ক্ষেত্রে অতীতেই হোক এবং পরবর্তী দুজনের ক্ষেত্রে সমসাময়িকই হোক, আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে আসছে। এঁদের সম্পূর্ণ অলেখক মনে করলে একটি শব্দও কাগজে কলমে করার কোনো উৎসাহ আমি পেতাম না। আমার বক্তব্য, যাওয়া, হাওয়া, খাওয়া—এসব শব্দকে কোনো ছন্দসূত্রেই তিনমাত্রা ধরার স্বাধীনতা বাংলা ভাষার কোনো কবির নেই; গদ্যছন্দকে ছন্দ নয় বলার মতো মূঢ়তা, কোনো কবির থাকার কথা নয়। নভঃচরদল, যা নভোচরদল করা যায় বা পুনর্যৌবন, যাকে 'ফের যৌবন' করা যায়, এই কি রোমাঞ্চকর যামিনী যা সহজেই এই কি রোমাঞ্চের যামিনী হতে পারে, যথাসর্বস্ব, যা যথাসমূহ বা যথাসকল হলেই ছন্দের কান অক্ষুণ্ণ থাকে এইসব সহজেই হতো যদি সত্যিই ছন্দ নিয়ে ঐ যত্ন, থাকতো। তাহলে মুখের বেসুর লাগতো না। যিনি নিজেকে কারিগর বলে দাবি করছেন তাঁর জানা উচিত যে উল্টে রাখা সাধের সিন্দুককে উল্টোনো সাধের সিন্দুক করে তিনি নিজেরই পিঠ বাঁচাতে পারতেন কায়ক্লেশে, 'আমি সিন্দুকে'র বদলে 'সিন্দুকে আমি' করলেও তা নিয়ে অন্তত এই প্রশ্ন তোলা যেত না। কোনো কবির ছন্দভুল তখনি ক্ষমা করা যায় যখন তা কানে বাজে না, অথবা এমন একটি মোক্ষম শব্দ এই ছন্দভুলের জন্য দায়ী যার এতটুকু হেরফেরে কবিতাটির নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শক্তি, মল্লিকা এবং জয়ের এইসবও কোনো কোনো লেখায় ব্যক্তিমন প্রথম থেকেই ধরা পড়ে—তাঁরা তালপ্রধান ছন্দ লিখছেন এইটা দেখাচ্ছেন। তা-ও সই, কিন্তু সেটা ভালোভাবে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে, চট করে প্যারডি না হয়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে, লেখা দরকার।

আমার নিজের একটু ছোটো পরিচয় দেওয়া দরকার। খবর কাগজে রাঘব, পিনাকেশ প্রভৃতি কাব্যসমালোচকরা লেখেন যে ছন্দমিলের খেলা ব্যতীত আমার বিশেষ কোনো সম্বল নেই। ১৯৬৬ সাল থেকে, যাকে ছন্দ বলে, ঐ জাতীয় লেখা আমি লিখে আসছি। অর্থাৎ জয় মল্লিকা বা আরো কেউ ছন্দে লিখলে ফলাফল একরকম, আমরা লিখলে অন্য, কেননা, জয় মল্লিকার 'কবিতা' উচ্চপদস্থ সাহিত্যজীবীদের চোখে পড়েছে। বেশ, তাহলে সেই কবিতার কথা কোথায় গেল?

ছন্দোগত ইতিহাসের এই তথ্যবিকৃতি অর্থাৎ আক্রমণের উদ্দেশ্য অনেক। প্রথম কারণই হলো, জিনিসটা যদিও অবজেকটিভ, বাংলার ছান্দসিকেরা কিন্তু প্রাঞ্জল পরিভাষা এখনো উপহার দিতে পারেননি। বাংলা অনার্সে ছন্দ পাঠ্য এবং ধার্য নম্বরও খুব বেশি নয়। বাংলায় এম-এ করা বহু ছাত্র এবং দুই তরুণ কবিকে আমি দেখেছি যে তালপ্রধান ছন্দের কান তাঁদের নেই। কথা বলতে গেলে স্বরবর্ণে চাপ দিয়ে স্বস্তি বোধ করেন এমন লোকদের তালপ্রধান ছন্দের কান থাকেও না।

এবার, অ্যাকাডেমিক অ্যাপ্রোচের দিক থেকে ছন্দ বোঝেন এমন কবিদের সংখ্যাও বেশ কম। জানলেও সেকথা অনেকে বলতে চান না—ও, তুই তাহলে ছন্দগুণে কবি—এই কথা শোনার ভয়ে। এই ভয় ষাট শেষ ও সত্তর প্রথমার্ধে বেশ ভালেই ছিলো, যদিও ছন্দে লেখা হতোই, আর কিছু না হোক, শক্তির লোকরঞ্জনী তালপ্রধান ছন্দের কারণে। আনুপাতিক হিসেবে বাঁধাছন্দে লেখার আগ্রহ সত্তরের শেষ থেকে বেড়েছে, কারণ, সুস্থিতি হোক বা বিশ্বাসহীনতা কোনো একটি সূত্র রাজনৈতিক দিক থেকে এক প্রত্যাশাহীনতাই পশ্চিমবাংলার এই আট দশকের চরিত্র। যদিও, তাতে, ছন্দোনৈপুণ্যের প্রসঙ্গ একেবারেই অবান্তর।

বাঁধাছন্দ সত্যিই কবিতার পক্ষে দরকারী কি? জবাব সোজা—কোনো কোনো কবির কোনো কোনো কবিতার পক্ষে দরকার। কিন্তু কবি হতে চাওয়া এবং কবিতা না পড়তে চাওয়া বাঙালির (যার নমুনা শক্তি চট্টোপাধ্যায় নিজে, ঐ কথোপকথনে যিনি কবুল করেছেন যে, 'আগে পড়তাম না, আজকাল পড়ছি'—এবং এই ভিত্তিতেই ছয়-সাত সব খারিজ) কাছে দুর্মর কুসংস্কার হলো যে, কবিতায় ছন্দ নেই? সে তো ভাবতেও পারি না। শক্তি সুনীল ইতস্তত ভ্রমণপূর্বক কবিতাপাঠ করে এইটা বুঝেছেন যে অন্য জটিল আপত্তির বদলে ছন্দোহীনতার অভিযোগই সোজা। ছয়-সাত দশকের ছোটো পত্রিকার অরণ্য কে ঘাঁটতে যাবে—এমন কি তাঁদেরই সম্পাদিত সংকলনে কি আছে কে দেখবে—যদিও দেখলেই বোঝা যাবে, শতকরা একশো ভাগ মিথ্যাকথা ছাড়া আর কিছুই তাঁরা বলছেন না। কোন্ ধরণের ছন্দ ষাট সত্তরে লেখা হয়নি, যা এখন লিখছেন জয় মল্লিকা সুবোধ? আবার বলছি, এসব বললে, সাবুদ দেখিয়ে, বলতে হয়—যা তাঁরা ভালই জানেন যে তাঁদের হাতে নেই। জনপ্রিয়তা ভিক্ষায় যাঁরা

জয় গোস্বামী

দুটি লেখা ব্যতীত অন্য লেখা পড়তে পারেন না, একুশ বছরেও গোদা ছন্দপতন সামলাতে পারেন না, তাঁরা কবিতাদেশ নিয়ে কথা বলার আগে পশ্চাদ্দেশ সামলান দয়া করে। সুনীল তো মাঝে মাঝে ইনিড স্টার্কি, ওর্ভিদ প্রভৃতি নানারকম নাম বলেন, কাফকা সাঁটে লিখতেন বলে বিক্রম প্রকাশ করে থাকেন—স্নেহধন্য কবিদের প্রধান কবি বানাবার জন্য, হায়, ছন্দের থেকে সূদ অছিলা কিছু খুঁজে পেলেন না তিনিও।

মল্লিকা সেনগুপ্ত

লেখা অনেক বড় হয়ে গেছে; অমিতাভ গুপ্ত ও গৌতম মুখোপাধ্যায়ের লেখা দুটির উদ্ধৃতি আর দিলাম না—এগুলি লুপ্তও হয়নি। আর দুটি তথ্য দাখিল করতে চাই। ১৯৭৯-এর ১৭ জুলাই রেডিওতে এক ২০ মিনিটের প্রোগ্রামে তরুণ কবিদের তালপ্রধান ছন্দের কবিতার কিছু নমুনা আমি শোনাই। তাড়াহুড়োয় ও ছোটো সময়ের কারণে অনেকেরই উল্লেখ হয়নি। যে ১৫ জনের কবিতা আমি সেদিন পড়ে শোনাই তাঁরা হলেন অমিতাভ গুপ্ত, রণজিৎ দাশ, অনির্বাণ লাহিড়ী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃদুল দাশগুপ্ত, সোমক দাস, জয় গোস্বামী, বীতশোক ভট্টাচার্য, স্বরাজ সিংহ, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী, গৌতম মুখোপাধ্যায়, গৌতম চৌধুরী, নিশীথ ভড়, শ্যামলকান্তি দাশ, সন্দীপ মুখোপাধ্যায়। কিছুদিন বাদে জানতে পারি, ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেই সেই কথিকা শুনেছেন এবং কবিতা সিংহকে স্বতঃপ্রবত্ত হয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। কবিতা সিংহ আমাকে সেই চিঠি রিডাইরেক্ট করে পাঠান। ঐ চিঠির জবাবে প্রবোধচন্দ্র সেনকে আমি আর একটা চিঠি পাঠাই—সবটাই কৃতজ্ঞতার কারণে নয়, একটু মজা লাগছিল এই ভেবে যে স্বরাজ সিংহের লেখাটিতে একটি লাইসেন্স নেওয়া ছিলো, তা প্রবোধবাবুর কান এড়িয়ে গিয়েছে। সেটা স্পষ্ট উল্লেখ করিনি; ১৬.৮.১৯৭৯-এর দ্বিতীয় চিঠিতে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখছেন:

''অনেক আধুনিক কবিদের ছন্দোদৈন্য দেখে বড়ই হতাশ হই। এই ছন্দোহীনতা সব সময় ইচ্ছাকৃত নয়, অনেক সময়ই অজ্ঞতা ও অক্ষমতাজাত। এই অবস্থায় সেদিন রেডিওতে এতগুলি তরুণ কবির ছন্দোনিষ্ঠা ও ছন্দোনৈপুণ্য দেখে অপ্রত্যাশিত আনন্দ পেয়েছি। আরও আনন্দ পেয়েছি পরিচালনার দক্ষতা ও ব্যাখ্যা শুনে। তাতে মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। পত্রিকায় মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে নিখুঁত সুন্দর ছন্দের সাক্ষাৎ পাই। ভাল লাগে। কিন্তু হঠাৎ কোনো ভালো ছন্দোময় কবিতা পড়ে আনন্দ হয়, তৃপ্তি হয় না। কিন্তু সেদিন একসঙ্গে এতগুলি তরুণ কবির ছন্দোনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া একটা দুর্লভ রত্নভাণ্ডারের সন্ধান পাবার মতোই বা সবিস্ময় সৌভাগ্য লাভের মতো প্রীতিকর। সে কথাটা জানিয়েছিলাম শ্রীমতী কবিতা সিংহকে।
যা হক, সেদিনের উৎসাহী পরিচালকের সঙ্গে যে এভাবে আমার যোগাযোগ হয়ে যাবে সেটা ভাবতে পারিনি। যোগাযোগ হখন হল তখন সেটা রক্ষাই কাম্য। আপনি ছন্দোময় রচনার 'বেশ কিছু নমুনা' আমাকে পাঠিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছেন। এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব আর কি হতে পারে? এগুলি তো আমার কাজেও লেগে যেতে পারে। আমার বই-এ প্রয়োজন মতো তার থেকে কিছু দৃষ্টান্তও উদ্ধৃত করতে পারি, যদি তেমনি যোগ্য সুন্দর রচনা পাই। একবার চলে আসুন না এখানে। সাক্ষাতে আলাপ করার আগ্রহ বোধ করেছি, সেদিন আপনার মুখে ছন্দের শ্রেণীবিভাগ ও ব্যাখ্যা শুনে।'' খেয়াল রাখবেন, যে সময় এই দুই চিঠি তখনো আটের দশক শুরু হয়নি। এঁদের উচিত নিঃশর্ত মাফ চাওয়া; বাংলা কবিতা এখনো এতো হিন্দী গানের জগৎ হয়নি যে এইসব লতা-আশাগিরি এখানে চলবে। জনপ্রিয়তা—যে অর্থেই হোক, একসময় এই দুজনেরই ছিলো আমরা জানি; এর ভিত্তিতেই এই বিক্রম। এবং সভাকবিতা, লাইফস্টোরি বা আপিশ লাইব্রেরির উপন্যাস—সব বিভাগেই তাঁদের জনপ্রিয়তা অত্যন্ত পড়তির দিকে, কোনো রঙতেল চোবানো সাপ্তাহিক বা ক্যাঙারু-দেশ ফেরৎ বুদ্ধিজীবী-কাম-দুর্গদ্যজীবীর নির্দিষ্ট এক তরুণ কবি ও আর এক তরুণী কবি সেই সোনালি দিনগুলি ফিরিয়ে দিতে পারবেন না। ৮৮-র শিশিরমঞ্চের কবিতা উৎসবে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট হাততালি অন্য কেউ পেয়েছেন বলেই এই রাগ তথা কবিতা ভাবনা তো? পদ্যবিষয়েও আলোচনায় ব্যক্তিগত বাড়ি-জমির উল্লেখে অভ্যস্ত এই নতুন, বিষম মানসিংহদের আবার জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে, 'করোতি/বাসং গিরিরাজদুর্গে/ তথাপি সিংহ পশুরেব নান্যঃ।' ■

**পুনর্বসু, ১৯৮৮/মার্চ**

# ৮. অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না

উৎপলকুমার বসু
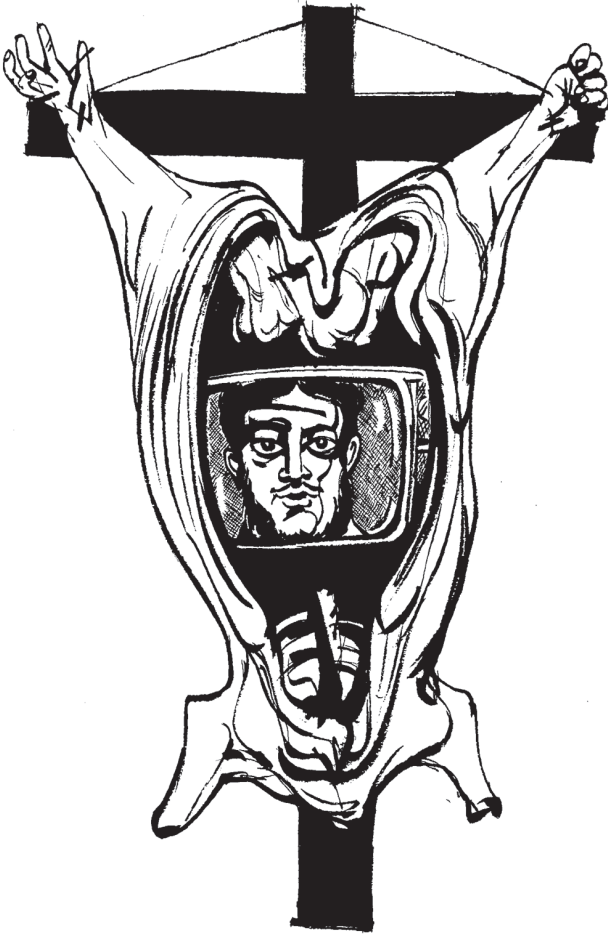
ছবি: সম্বরণ দাস

কবে শেষ হল আধুনিকতার যুগ?

কেউ কেউ বলেন, ১৮৮৯ সালের ৩ জানুয়ারী যেদিন চিকিৎসকরা জানালেন যে নীট্‌শে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেছেন। আরেক দল বলেছেন, ১৫ জুলাই ১৯৭২ বিকেল তিনটে বত্রিশে যখন আমেরিকার সেন্ট লুইস শহরের একদল নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিক তাদের আধুনিক বহুতল বাসগৃহ কমপ্লেক্স বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। ঐ বাড়িগুলি কর্বুসিয়ের-য়ের 'মেশিন ফর লিভিং' বলে খ্যাত হয়েছিল। যেদিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি ঘাতকের গুলিতে নিহত হন (১৯৬৩), অনেকের মতে, তখনই আধুনিকতার যুগ শেষ হল।

এই তালিকায় আধুনিকতার আরো একটি সম্ভাব্য অন্তিম মুহূর্তের উল্লেখ আমি করে রাখি। বুঝি একটু দুর্বিনয়ের ছোঁয়া লাগবে। তা পৃথিবীর সব দাবীই অল্পবিস্তর দুর্বিনীত।

আমি বলি, ১৯৭৮ সালের মধ্য বৈশাখে যখন ফালগুনী রায় 'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন' বইটি আমার হাতে তুলে দেয়। বই বললে অবশ্য সেই ক্ষীণ সংগ্রহটিকে অপ্রয়োজনীয় সম্মান দেখানো হবে। তখন বেলা এগারোটা। ফালগুনী শুখো নেশায় চুর। ফুটপাথে টলছে। বইটি এগিয়ে দিতেই আমার সন্দেহ হয় একটি পর্নোপুস্তক কিনা। সেইভাবে, গোপনে, সে বইটি আমার হাতে গুঁজে দেয় এবং আমি খানিকটা চমকেও উঠি। কেননা তাকে আমি চিনতাম না। সে তখন আমার কানে কানে বলে—পট্টভির পরাজয়, আমার পরাজয়।

ঐ তার সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ দেখা। তারপর কতজনের কতশত কাব্যগ্রন্থ বেরোল, হারিয়ে গেল ও পুরস্কৃত হল (এবং হল না), এডিশন হল (এবং হল না), কত কুয়াশাচ্ছন্ন প্রকাশক হাত নেড়ে বলে গেলেন, না না, কবিতার বইয়ের সেল-টেল কিছু নেই।

কিন্তু সবকিছুর উপর আমাদের এই লেন-দেন, দাওয়া-থোওয়া, পাওনা-গণ্ডার সমাজসাহিত্যের উপর-ফালগুনী রায়ের এই ভয়ঙ্কর বই আততায়ীর হাসির মতো আজো অম্লান। কেউটের চোখের মতো নিষ্পলক তার নেশাতুর চাউনি।

আটের দশকের প্রথম দিকে ফালগুনী মারা যায়। অনতিকাল পরে মারা যায় ওর দাদা তুষার রায়, যে ছিল আমার বন্ধু। তার কাছে শুনেছিলাম যে ফালগুনী নাকি শেষদিকে এখানে-ওখানে আমার খোঁজ করে বেড়াত। কেন, কে জানে?

ফালগুনীর সৎকারে কোনো ধুমধাম হয়নি। সামান্য কয়েকজন শ্মশানবন্ধু ছিলেন। বিউগল বাজেনি। একুশটি তোপধ্বনিও হয়নি।

খোলা চিতায় তার অবহেলিত দাহ হয়। বৈশাখের তপ্ত বাতাসে, আজ যেমন করে কবিতার বইয়ের পাতাগুলি, প্রায় তেমনই অবহেলায়, উল্টে যাচ্ছে নিজে নিজেই। ■

**ফালগুনী রায় সমগ্র এবং তাঁর লেখা সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা**
**সম্পাদনা: সমীর রায়চৌধুরী ১৯৯৮**

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

বৈশাখ ১৪২২ ● এপ্রিল ২০১৫

## ৯. নষ্ট আত্মার টেলিভিসন ফালগুনী রায়

আমার হাতে আমি দেখি রোজ আমার হাতে ডবল ব্রেনলাইন শোনা যায় যা হস্তরেখাবিদ কিরোর হাতে ছিল আমি বিশ্বাস করিনা হাত দ্যাখা আমি বাসের হাতলে ঝুলে শুনে ফেলেছি কবিতা ও মৃত্যুর ধ্বনি আমার করোটীতে বিধিলিপির বদলে হাড়ের কাঠামো বোমার শব্দে বা গুলির শব্দে আমার জেগে ওঠে মৃত্যু ভয় আমি বিপ্লবকামী মানুষ একজন কামের আবেগে চুমু খেয়ে পাই স্বর্গাতীত আনন্দ অন্য অনেক সময় ইত্যকার অনুষ্ঠানে অনীহা নিহিত থাকে দেহের ভিতরের বিস্ময়ের দেবতা মনের মধ্যে কবিতা লেখার জন্যে নেশা করে কাব্য ভাবনায় অনিচ্ছা জন্মায়—বিপ্লবীদের পাইপগানের ছিটকিনি পরিষ্কার করে দেবার পরেও অনিচ্ছা জন্মায় গুলি চালাতে আমি শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম অনুযায়ী একযোগে নকশাল ও মিলিটারী প্রতি আমার ভালোবাসা বিলোবার ফলে আমি দুপক্ষের শত্রু হয়ে গেলাম আমি দেখেছি আমার ক্ষিধে পেয়েছে
আমায় রুটি দাও বা আমার চাক্রীর দরকার আমায় একটা চাক্রী দাও বললে কেউই একটা রুটী কিমবা চাক্রী পায়না তার কাছে পিকাসো সাত্র সত্যজিতের থেকে তখন একটা রুটী চাক্রীর কামনা বেশী আসলে মানুষ দেখে ফেলে যৌনতা ও অর্থনীতি দিয়ে তৈরী বাবামাভাইবোন নিজের বউ পরের বউময় সমাজ আমি হাতের করতলে দেখি ডবল ব্রেনলাইন—যা কিরোর হাতে ছিল—আমি বিশ্বাস করিনা হাত দ্যাখা তবে হাত্মেরে আমার আত্মা লক্ষ করেছে অনেক নারী রয়ে যাচ্ছেন অনায়াত্তা আমার অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাবে এই ব্যাপারটা আমার রাষ্ট্রবিপ্লবের পথে ঠেলে দ্যায় অর্থাৎ সুকান্তের ভাষায় প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা ভেঙেছিস ঘরবাড়ি সে কথা আমি কি সহজে ভুলতে পারি এই লাইনগুলোকে আমি ব্যবহার করি একপ্রকার মানসিক সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে কিন্তু আমার প্রিয়ার ভূমিকাটি যে মেয়েটি পালন করত সে নিজেই নিরাপত্তার ফ্রিজসভ্যতার দিকে চলে যায় এবং তারপর থেকে আমি হ্যাভলকএলিসের গৌন মনস্তত্ব আর জগদীশবাবুর গীতা জুড়ে আমি বানিয়ে ফেলেছি আমার যোগাসন ফ্রয়েড পড়বার অনেক আগেই আমি বুঝে গেছিলুম কাকে বলে অয়দিপাউস কমপ্লেক্স কিন্তু নিজের মার সঙ্গে করতে ভালোলাগে না আমার কিন্তু সময় মায়ের বয়সী মহিলার শরীরের স্বাদ নেবার প্রবণতা আমার থেকে গেছিল কিশোরকালের দুরন্ত দুপুরে আমি আত্মহত্যা করবার জন্যে একবার বেরিয়েছিলুম পথে কিন্তু পেটোর উপর্যপুরি শব্দের ফিরে আসি প্রাণভয়ে আমি দাস ক্যাপিটাল না পড়েই বুঝেছিলুম কাকে বলে হিংসাত্মক বিপ্লব—হিংসা ভালোলাগে না আমার বিপ্লব ভালোলাগে জোতদার ও কৃষকের যুদ্ধময় ধান ক্ষেতে আমি ও খেয়েছি খুব ধানশীষের দুধ—ধান সেদ্দ মদের দোকানে ধানসিড়ি নদির কিনারের কবির জন্মদিন পালন করে খুঁজেছি জীবনের আনন্দ অনেক সময় আমার কাছে চার্মিনার থাকে

> দেশলাই থাকে না
> দেশলাই থাকে
> থাকে না চার্মিনার

যৌনতা থাকে কিন্তু প্রয়োগ করবার জন্য আধার বা রাধা বা রমনী মানে মেয়েছেলে থাকেনা মেয়েছেলে থাকে যৌনতা থাকে না—প্রত্যুৎপন্নমতি থাকে অবিমৃষ্যকারী থাকে না অবিমৃষ্যকারী থাকে প্রত্যুৎপন্নমতি থাকে না এভাবেই দিন যায় রাত যায় একটু অন্যভাবে দিনরাত কাটিয়ে আমার বাঙালী বাবা মা জন্ম দিয়েছেন আমায় সময়ের ভেতর অর্থাৎ বাবার শরীর মায়ের শরীরে দুই শরীরের মিলনে আমার একটি শরীর অর্থাৎ দ্বৈত থেকে অদ্বৈত হওয়া এভাবেই পিতা হবার ইচ্ছাকে আমরা লক্ষ করি স্বয়ংরতির ভেতর তরল বীর্যস্রোতে দুশো ছয় হাড়ের কাঠামো ও কাঠামোর সংলগ্ন মাংসল স্নায়ুর চিন্তাবাহন শব্দের স্মৃতি ধারণের বীজ তরল বীর্যের ভেতর কি আশ্চর্য মিষ্টার খান্না—হিন্দীভাষী কিন্তু কিমাশ্চর্য তার স্ত্রী বাঙালী হওয়ায় মিষ্টার খান্নার পাঁচ বছরের ছেলে বাঙলা হিন্দী দুটোই বলতে পারে জিভ দাঁত তালু কণ্ঠ ওষ্ঠের সম্যক ব্যবহারে আচ্ছা সে কি তার ভ্রূণকোষের নাইট্রীক অ্যাসিডগুলির ভেতর নিয়ে এসেছিল তার কথা বলা ও বোঝার ক্ষমতা প্রিয় হেরিডিটী ভাষা জিনিসটা কি হেরিডিটী—পরিবেশ না প্রয়োজন কার দরকার ভাষা গঠনে—ভালোবাসার ভাষা আছে কিনা জানিনা তো হেরিডিটী অনুভূতির ভাষা শুধু দেখি একই কায়াবিশিষ্ট মানুষ কেউ হতে চাইছে জেমসজয়েস কেউ আলামোহন দাস অথচ কাউর জন্মের ওপর তার নিজের কোন হাত নেই কোন সুজুকির জন্মের পেছনে বুদ্ধের কোন হাত ছিল কি?
আমার সাহেব মেম বন্ধুবান্ধবীরা তোমরাও বাঙলা জানোনা জন্মসূত্রে যেমন অনেক বাঙালী জন্মসূত্রে জানে না ইংরিজি তোমাদেরও খিদে পায় বাড়ি খোঁজার সময় তোমরাও দ্যাখো পাইখানা বাথরুম আমাদের মত ভিয়েত্নাম যুদ্ধের প্রতিবাদ করো তোমরা আমাদের মত অ্যালেন গীন্সবার্গ স্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের ভেতর দিয়ে দেখতে পান তাঁর কবিতার নদি তবু শালা আমি বাঙালী ম্যাক্সমুলার পড়ে জানবো শতপথ ব্রাহ্মণের ভগবান তাই সোম ও সুরা মানে সিদ্ধি ও মদ পান করবো একযোগে প্রায়শ সন্ধ্যায় আর বুদ্ধদেব বসু হাংরিদের নিরক্ষর বলে বীটবংশের ওপর লিখবেন ধীমন প্রবন্ধ—হায় আমার চিন্তার ভাষা কেন ইংরিজি হোলনা কেন আমার বাবা মা বাঙালী—হায় বাঙালী কেন বল তুই কবি হলি— ■

**নষ্ট আত্মার টেলিভিসন ১৯৭৩**